কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল

যথার্থ বিপ্লবী দল ব্যতীত বিপ্লব অসম্ভব এবং ভারতবর্ষে এধরনের কোন দল নেই — এই উপলব্ধি থেকেই একটি যথার্থ সাম্যবাদী দল রূপে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার কঠিন সংগ্রাম শুরু হয়। দল গঠনের এই সংগ্রামের ভিত্তি রূপে ছিল পার্টি সংগঠন সংক্রান্ত লেনিনীয় নীতি ও তার দু'টি স্তম্ভ — গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এবং যৌথ নেতৃত্ব। ভারতবর্ষে একটি সাম্যবাদী দল গঠনের প্রচেষ্টায় অন্যান্যদের ব্যর্থতার কারণগুলিকে সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করে ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশের ইতিহাসকেও এই ভাষণ প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছে। দল বিচারের ক্ষেত্রে সঠিক মানদণ্ড হিসাবে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানের অপরিহার্যতার দিকটিও এই ভাষণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কমরেডস্

আমাদের দেশে দু'টি কমিউনিস্ট পার্টি থাকা সত্ত্বেও আমরা এস ইউ সি আই'কে কেন শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে আপনাদের আহ্বান করছি — এই প্রশ্নটি আলোচনা করার জন্য আপনারা আমাকে অনুরোধ করেছেন। প্রশ্নটি খুবই স্বাভাবিক। তবে কমিউনিস্ট পার্টি তো এখন আর দু'টি নয়। শুনছি শীঘ্রই একটি তৃতীয় পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। প্রথমে অবশ্য এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামে একটিই পার্টি ছিল। ১৯৬৪ সালে সেটি ভেঙে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) নামে দু'টি পার্টি হয়েছে। এখন আবার নকশালপন্থী বলে পরিচিত কমিউনিস্ট নেতা এবং কর্মীরা সি পি আই (এম) থেকে বেরিয়ে এসে আর একটি দল গড়ার আয়োজন করেছেন। ফলে, পুরনো কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি এখন তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির তিনটি ধারার কোন একটিকেও সমর্থন না করে কেন এস ইউ সি আই'কেই সমর্থন ও শক্তিশালী করবার জন্য আপনাদের আমরা আহ্বান করছি — আমার মতে প্রশ্নটি এইভাবে রাখলেই ঠিকভাবে রাখা হবে।

ভুলের প্রকৃতি নির্ধারণই কমিউনিস্টদের কাছে মূল বিচার্য বিষয়

প্রথমেই একটি বিষয় আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই। এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি অসংখ্য ভুল করেছে, কেবলমাত্র এই কারণেই যে আমরা এস ইউ সি আই-কে আর একটা পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তুলেছি — একথা ঠিক নয়। একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল কখনই ভুল করতে পারে না — একথা আমরা মনে করি না;বা, সে দলটি ভুল করলেই তৎক্ষণাৎ আর একটি পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে — একথাও আমরা মনে করি না। কোন সত্যিকারের মার্কসবাদীই এভাবে চিন্তা করে না। কারণ, যারা কিছুই করে না, ভুল একমাত্র শুধু তারাই না করতে পারে। যে দল শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের মতো দীর্ঘ এবং জটিল সংগ্রাম পরিচালনা করে, ভুল সে দলের তো হতেই পারে এবং হয়েও থাকে। মার্কসবাদী মাত্রই এটা জানে। কিন্তু, সাথে সাথে মার্কসবাদীরা এটাও জানে যে, একটি দল দু'ধরনের ভুল করতে পারে। তার একটি হ'ল, মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি আয়ত্ত করতে না পারার ফলে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্কসবাদ নির্ধারিত মূলনীতিগুলি অনুসরণের ক্ষেত্রে ভুল এবং তার ফলে একটি বিশেষ বিপ্লবের স্তর এবং তার রণনীতি, অর্থাৎ একটি বিশেষ বিপ্লবের মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভুল। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ভুলের সাথে দলের শ্রেণীচরিত্রের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আর, দ্বিতীয় ধরনের ভুলটি হ'ল, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে মূলত ঠিক থেকেও দলের উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে মূলনীতিগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল। এই শেষোক্ত ধরনের ভুল হলেই যে সাথে সাথে

দলটির শ্রেণীচরিত্র পাল্টে যায় — তা নয়। অবশ্য এ ধরনের ভুল যদি একটার পর একটা হতেই থাকে এবং এই ভুলগুলির থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে যদি শেষপর্যন্ত সেগুলিকে সংশোধন করা সম্ভব না হয়, তাহলে ধীরে ধীরে একদিন দলটির শ্রেণীচরিত্রও পাল্টে যেতে বাধ্য। কিন্তু, প্রথম ধরনের ভুল, অর্থাৎ মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতি, তার সাথে দলটির শ্রেণীচরিত্রের প্রশ্নটি সরাসরিভাবে জড়িত। কারণ, একটি দল শুধুমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেকে জাহির করছে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 'ভোকাবুলারি'র (শব্দাবলীর) সাহায্যে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করছে, অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণ করছে না, মানেই হচ্ছে — সে দলটি জ্ঞাতসারেই হোক্, অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক্ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সাম্যবাদের ঝান্ডা উড়িয়েই আসলে অন্য কোন শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। **তাই ভুল করে ভুল স্বীকার করাটাই বড় কথা নয়, ভুলের চরিত্র নির্ধারণই মার্কসবাদীদের কাছে মূল বিচার্য বিষয়।**

ফলে, কোন দেশে একটি পার্টি একটি সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল হিসাবে গড়ে উঠলেই যে সে দল কখনও ভুল করতে পারে না, এটাও যেমন ঠিক নয়; আবার, সে দল হাজার একটা ভুল করেছে বলে শুধুমাত্র তার দোহাই দিয়েই কোন মার্কসবাদীরই অপর একটি পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার নৈতিক অধিকার আছে — এটাও আমি মনে করি না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি অতীতে অনেক ভুল করেছে এবং এখনও করে চলেছে, কেবলমাত্র এই কারণেই আমরা এস ইউ সি আই-কে গড়ে তুলিনি। এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি গঠনের পিছনে এ দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকের এবং অনেক নেতা ও অসংখ্য কর্মীর গভীর নিষ্ঠা, সততা ও আত্মত্যাগের কথা আমি জানি এবং আমি তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। কিন্তু, তাঁদের এত আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ না করার জন্য তাঁরা যে এ দলটিকে একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল হিসাবে গড়েই তুলতে পারেননি, এ সত্যকেও আমি কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য মানেই অন্ধ অনুকরণ নয়

প্রথমেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সাথে এদের সম্পর্কের চরিত্র কী ধরনের, সে সম্বন্ধে যদি আপনারা বিশ্লেষণ করেন তাহলে সহজেই দেখতে পাবেন যে, এ ব্যাপারে গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত কোনদিনই এই পার্টিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামী অংশ (vanguard) হিসাবে সঠিক সচেতন ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বরং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে এই দলের নেতারা বরাবরই অন্ধের মতো অনুকরণ করে এসেছেন। এই অন্ধ অনুকরণের ফলে তাঁরা দেশের অভ্যন্তরেও যেমন সঠিক বিপ্লবী সাম্যবাদী আন্দোলন কোনদিনই গড়ে তুলতে পারেননি, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতবাদিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, সেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রেও কোনরূপ ভূমিকাই পালন করতে পারেননি। বরঞ্চ , এই অন্ধ অনুকরণের দ্বারা তাঁরা বাস্তবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে দুর্বল করতেই সাহায্য করেছেন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য কথাটা যদি তাদের অন্ধভাবে অনুকরণ করা বোঝায়, তাহলে তা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি মনে করি, মার্কসবাদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য কথাটা কোনও অবস্থাতেই তাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য বোঝায় না, বরং একই উদ্দেশ্যে সমাজপ্রগতি, মুক্তি ও বিপ্লবের জন্য লড়াইয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, অর্থাৎ 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যে'র ভিত্তিতে সম্পর্ক বুঝিয়ে থাকে। আর, এ সম্পর্কের প্রকৃতি দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের নীতির দ্বারা নির্ধারিত — অর্থাৎ এ সম্পর্ক একই সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের সম্পর্ক। এই দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ বাস্তবে জীবন্ত রূপ নিলে তবেই একমাত্র আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের চিন্তাগত ও আদর্শগত ক্ষেত্রে বিকাশলাভের পথ উন্মুক্ত হতে পারে এবং এর দ্বারা শুধু যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বই উপকৃত হয় তাই নয়, আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাথে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বন্দ্বের প্রকৃতি যদি মিলনাত্মক (non-antagonistic) চরিত্রের হয়, অর্থাৎ আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অর্থাৎ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে একে অপরের সহায়ক হয় (mutually conducive), তাহলে এর দ্বারা উপকৃত হয়ে বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী আন্দোলন সঠিক পথে

পরিচালিত হতে সক্ষম হয়।

এই ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলার মধ্যে অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে অবশ্যই বিভিন্ন সময়ে নানা গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিতে বাধ্য। এখানে সবসময়েই একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে অথবা আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাথে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির যে মতপার্থক্যগুলি ঘটে তার বিষয়বস্তুগুলিকে আলাদা আলাদা করে ধরলে এই দ্বন্দ্বের চরিত্র প্রায়শঃই বিরোধাত্মক (antagonistic) প্রকৃতির, কিন্তু বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে পরস্পরের মধ্যে গৃহীত মূল সূত্রগুলোর (accepted fundamental) পরিপ্রেক্ষিতে ধরলে এই দ্বন্দ্বের বিরোধাত্মক চরিত্র আবার তৎক্ষণাৎ মিলনাত্মক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে সাম্যবাদী শিবিরের সংহতি, ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা বজায় রাখার জন্য পরস্পরের মধ্যে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার সময়েও ঐক্য বজায় রাখা একটা আবশ্যিক দায়িত্ব বা কাজ হয়ে পড়ে।

এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটি, অর্থাৎ একইসঙ্গে আদর্শের ক্ষেত্রে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ও সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পরস্পরের মধ্যে ঐক্যকে বজায় রাখার নীতিটি, সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলে নিজ নিজ দেশের সাম্যবাদী আন্দোলন যেমন দুর্বার শক্তি নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে, সাথে সাথে এই দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে মার্কসবাদের তত্ত্বের সাধারণ ভাণ্ডারও ক্রমাগত সমৃদ্ধিশালী হতে থাকে। এইভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার বিপ্লবী তত্ত্বগুলিকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত, বিশেষীকৃত করা এবং তার দ্বারা মার্কসবাদকে বিকশিত করতে না পারলে কোন দেশেই যথার্থভাবে বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভব নয়। তাই দেখতে পাবেন — লেনিন, মাও সে-তুঙ —যাঁরাই হাতে কলমে বিপ্লব সংগঠিত করেছেন, তাঁরাই মার্কসবাদের ভাণ্ডারে নতুন কিছু সংযোজন করেছেন। এ না করে কোন দেশে বিপ্লব সফল করা যায় না। আমাদের দেশে যখন কেউ বলেন, চীনের রাস্তায় বিপ্লব হবে বা রাশিয়ার রাস্তায় বিপ্লব হবে, আমি বলি, এ কথাগুলোর শুধু এইটুকুই মানে হতে পারে যে, ওখান থেকে আমরা একটা দিকনির্ণয়কারী (indicative line) রাস্তা পেয়েছি। এর বেশি এক ইঞ্চি গেলেই আমরাঅন্ধতায় ডুবে যাব এবং এই অন্ধতা যত বেশি হবে, উগ্রতা ও একপেশে ঝোঁক তত পরিমাণে বাড়বে এবং ঠিক এই ঘটনাই বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাথে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলির ব্যর্থতা

এখন, যে কথা বলছিলাম; আমাদের দেশে কমিউনিস্ট নামধারী বর্তমানে মূলত তিনভাগে বিভক্ত এই পার্টিটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের এই সাম্যবাদী রীতিটিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনদিনই অনুসরণ করেনি। নেতৃত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টির দোহাই পেড়ে এই পার্টিটি জন্মের পর থেকে সোভিয়েট নেতৃত্বকে এবং সোভিয়েট-চীনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ার পর থেকে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে একদল সোভিয়েট নেতৃত্বকে এবং আর একদল চীনের নেতৃত্বকে — এখানে চীন বা সোভিয়েট কে ঠিক, কে বেঠিক, সে প্রশ্ন গৌণ — অন্ধের মতো অনুকরণ করেছে। এই দলগুলির তত্ত্বগুলোকে যদি ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে আমাদের কথার সত্যতা আপনারা সহজেই ধরতে পারবেন।

যদিও একথা ঠিক যে, বর্তমানে সি পি আই (এম) ঘটনাচক্রে সোভিয়েট এবং চীন দু'পক্ষেরই 'অফিসিয়াল রিকগনিশন'-এর (স্বীকৃতির) ফাঁকে পড়ে গিয়েছে। কারণ, সি পি আই (এম) থেকে নকশালপন্থী নেতা ও কর্মীরা বেরিয়ে যাবার পর থেকে চীনের পার্টি সি পি আই (এম)-কে কমিউনিস্ট পার্টি বলে গণ্য করছে না, সি পি আই-কে তো পূর্বের থেকেই করেনি। আর, সি পি আই অফিসিয়ালি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা স্বীকৃত পার্টি। ফলে, যতক্ষণ তার স্বীকৃতি থাকছে, ততক্ষণ সি পি আই(এম) একই সঙ্গে স্বীকৃতি পেতে পারে না, যদিও ইদানীং, বিশেষ করে কোসিগিন যখন দিল্লীতে এসেছিলেন তখন তাঁর সাথে সি পি আই (এম) নেতাদের আলোচনা এবং সোভিয়েটে সি পি আই(এম) নেতা রণদিভেকে আমন্ত্রণ প্রভৃতি জিনিস লক্ষ করে এবং কোসিগিনের চালচলন সম্পর্কে নানাদিক থেকে খবর যা আসছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সি পি আই(এম)-এর প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের একটা নরম মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে, পার্টি ভাগ হওয়ার সময়ে সি পি আই(এম) তার 'র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল'কে শোধনবাদবিরোধী এমন একটি

জিগির তুলে 'প্যাটার্ন' করার চেষ্টা করেছে যে, সে আজ চাইলেও হঠাৎ করে সোভিয়েটের দিকে যেতে পারে না। তাই তাকে আপাতদৃষ্টিতে পুরনো লাইনই চালিয়ে যেতে হচ্ছে, যদিও সূক্ষ্মভাবে সে লাইন পাল্টাবার চেষ্টা করছে এবং এটা সে এত সূক্ষ্মভাবে করছে যে, উঁচুদরের তত্ত্ববিচারের ক্ষমতা অর্জন করতে না পারলে কোন কর্মীর পক্ষেই তা টের পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, ডাঙ্গে-চক্র শোধনবাদীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বুক্‌নিগুলোকে আওড়াতে আওড়াতেই এমন চাতুরির সাথে তারা পিছু হটছে এবং শোধনবাদী হয়ে পড়ছে যে, আজকালকার কমরেডদের এবং কমিউনিস্ট সমর্থক জনসাধারণের চেতনার মান যে স্তরে রয়েছে তাতে তাদের পক্ষে, নেতাদের গরম গরম বিপ্লবী বুকনি ও আচরণের আড়ালে, এই পার্টিটিও যে আসলে একটি শোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে তা ধরতে পারা সম্ভব হচ্ছে না।

একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, এই পার্টিটি বর্তমানে ইউরোপীয়ান এমন সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে যারা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক তো নয়ই, বরঞ্চ পিকিং লাইনের ঘোরতর বিরোধী। একদিকে তাঁরা বলছেন, তাঁরা সংশোধনবাদকে ফাইট করছেন, অন্যদিকে একেবারে চরম দক্ষিণপন্থী, যারা আন্তর্জাতিককমিউনিস্ট ভ্রাতৃত্বের কোনরকমের সম্পর্ককে, এমনকী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন সাধারণ মূল সিদ্ধান্ত (general fundamental line) গ্রহণ করাটাকেই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে, যারা কোন আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব (international centre of leadership) গড়ে তোলার নীতির পর্যন্ত বিরোধী, যারা উগ্র স্বাধীনতার চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত এবং শোধনবাদী হিসাবে যারা সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির থেকেও অধিকতর দক্ষিণপন্থী, সেই রুমানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তাঁদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠছে। দু'জনে দু'জনকে খুব তারিফ করে।

এঁরা বর্তমানে সোভিয়েট অথবা চীন কোনদিকেই সরাসরি না যেতে পেরে এমন একটা পন্থা নিচ্ছেন, যেন এরা 'নিউট্রাল' (নিরপেক্ষ)। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, নিজেদের নেতৃত্বের কোন্দলের জন্য, গ্রুপ-এর কোন্দলের জন্য — কোন মূলনীতিগত মতপার্থক্যের জন্য নয় — আলাদা হওয়ার ফলে সি পি আই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এঁরা সোভিয়েটের দ্বারাও স্বীকৃত হতে পারছেন না, অথচ পিকিং-এর পথে যাবারও এঁদের ক্ষমতা নেই। কারণ, মুখে বিপ্লবী গরম গরম যত বুক্‌নিই দিক, আসলে পার্টিটির চরিত্র হচ্ছে পুরোপুরি সংশোধনবাদী। একথার মানে পিকিং-নির্ধারিত বিপ্লবের পথে এদেশে যাঁরা অন্ধের মতো পা বাড়িয়েছেন তাঁরা সত্যিকারের বিপ্লবী — এ কথা আমি বলছি না। সে আলোচনা আমি পরে করছি। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সি পি আই (এম) নেতৃবৃন্দ এখন চীন ও সোভিয়েটের দুই ধারার মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করছেন, অর্থাৎ তাঁরা এখন 'নিরপেক্ষ' ! এই 'নিরপেক্ষ' কথাটার বাস্তব প্রয়োগ তাঁদের মধ্যে কী দেখা যাচ্ছে? আসলে তাঁরা বর্তমানে একটি স্বাধীন, জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি 'টাইপে'র পার্টি গঠনের চেষ্টা করছেন। যদিও আজ কারোর দ্বারা স্বীকৃত নয় বলেই তাঁরা জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পথে পা বাড়িয়েছেন, কিন্তু আমাদের একথার দ্বারা এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, কাল কারোর দ্বারা স্বীকৃত হলেই তাঁদের জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের চরিত্র পাল্টে যাবে।

কারণ, আজও আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের যে আবেদন আছে তার গৌরবটুকু সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দিকে এঁদের যেতেই হবে এবং তার জন্য এঁরা যথেষ্ট চেষ্টাও করে যাচ্ছেন। কিন্তু তা হলেও তাঁরা যে সরাসরি জাতীয়তাবাদী টাইপের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দিকেই ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন, সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। সি পি আই আন্তর্জাতিকতার যাই দোহাই পাড়ুক, তার চিন্তাভাবনার ধরন এবং মানসিকতা ইতিপূর্বেই সমস্ত দিক থেকে জাতীয় চরিত্রের হয়ে গেছে। সি পি আই (এম)ও সেইদিকেই, অর্থাৎ জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি টাইপের একটি পার্টি গঠনের দিকেই যাচ্ছে। কায়েমি স্বার্থ এবং জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যত বড় বড় কথাই তাঁরা বলুন, ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠীর তাঁদের প্রতি মনোভাব, বর্তমানে ব্রিটিশ 'বিগ বিজনেস'-এর মুখপত্র 'গার্ডিয়ান' কাগজে জ্যোতিবাবুর প্রশস্তি, কেরালায় যখন তাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তখন সেই সরকারের প্রতি বিড়লার মনোভাব, বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় তাঁদের হাতে শ্রমদপ্তর থাকা সত্ত্বেও যে বিগ বিজনেস হাউসের গতবারের যুক্তফ্রন্টের আমলে খুব গরম সুর ছিল, এবারে তাদের নরম সুর এবং সি পি আই (এম) সম্পর্কে ব্যুরোক্রেসি ও বিগ বিজনেস হাউসের, বিশেষ করে বিড়লাজির প্রশস্তি — এগুলিকে চোখ না বুজে ভালভাবে লক্ষ করলেই যেকোন সৎ মানুষ এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একটু সচেতন কর্মীর পক্ষেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, কী ধরনের কমিউনিস্ট

হবার পথে তাঁরা এগোচ্ছেন।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, আগের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরবর্তীকালে তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর তিনটিরই ইতিহাস যদি আপনারা লক্ষ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বে তাঁরা আজ পর্যন্ত যখনই যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সবই আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের দোহাই দিয়ে করেছেন। চিরকাল হয় সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি না হয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অথবা আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে গৃহীত সাধারণ নীতির (general line) ঠিক হুবহু কপি করে তাঁরা ভারতবর্ষের সমাজকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ও আমি আলোচনা করতে চাই যেটিও তাঁরা মোটেই লক্ষ করেননি। যখন বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মতামত এবং অভিজ্ঞতার বিনিময় ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সাধারণ তত্ত্ব (general line) গড়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে সেই বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মূল তত্ত্ব (fundamental general line)। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত এই সাধারণ তত্ত্ব হুবহু অনুকরণ করে কোন দেশে বিপ্লব হতে পারে না। কারণ, এই সাধারণ তত্ত্বকে প্রতিটি দেশে প্রয়োগ করতে গেলেই সেই দেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গে কতগুলো পার্থক্য দেখা দেবে, অর্থাৎ দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। এই দ্বন্দ্বকে সঠিকভাবে সমাধান করতে সক্ষম হলেই তবে একটি দেশের বিশেষ পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণের পথে সেই দেশের বিপ্লবের বিশেষ লাইনটি গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেটাই হবে সেই বিশেষ বিপ্লবের বিশেষ তত্ত্ব।

সাধারণ মূল তত্ত্ব এমনকী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পরেও সাধারণের সাথে বিশেষের এই যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যদিও সে দ্বন্দ্বের চরিত্র একে অপরের পরিপূরক (mutually conducive to each other), তবুও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আছে এবং তা সবসময়ই থাকবে। সাধারণের সাথে বিশেষের এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চরিত্রকে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী পূর্বের অবিভক্ত পার্টিটি এবং বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত কোন পার্টিই পূর্বেও ধরতে পারেনি এবং আজও ধরতে সক্ষম হচ্ছে না। তাঁরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সিদ্ধান্তগুলোকে মেনে চলা মানে হচ্ছে, হুবহু সেগুলোকে অনুকরণ করা, অথবা একটু যোগ-বিয়োগ করে বা প্রকাশভঙ্গি একটু পাল্টে সেই বিপ্লবের লাইনটিকেই আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। সি পি আই-এর জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (আসলে যা বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক ধারাকেই প্রতিফলিত করছে) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার তত্ত্ব, সি পি আই (এম) -এর সরাসরি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, অথবা নকশালপন্থীদের ভারতবর্ষকে আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ব্যাখ্যা করে গ্রামে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে করে শহর ঘিরে ফেলার তত্ত্বকে যদি আপনারা বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, এই তিন পার্টিই ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে আগাগোড়া আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে বা বৈঠকে গৃহীত সাধারণ তত্ত্ব, অথবা সোভিয়েট নেতৃত্ব বা চীনের নেতৃত্বের ব্যাখ্যাকেই অন্ধের মত হুবহু অনুকরণ করেছে এবং এইভাবে ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থার ঘাড়ের ওপর একটা তত্ত্ব চাপিয়ে তারপর সেই তত্ত্বের সপক্ষে যুক্তি এবং মনগড়া মালমশলা যোগাড় করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা কোনদিনই আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ওয়াকিবহাল করার জন্য বা নিজেদের বিশ্লেষণ দ্বারা তাদের বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করার জন্য কোন চেষ্টাই করেননি। বরং এদেশের অবস্থা ও আন্দোলনগুলো সম্পর্কে ভুল চিত্র এবং অতিরঞ্জিত বিবরণের দ্বারা চিরকাল আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকে ভুল পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করেছেন। যেমন, নকশালপন্থীরা বর্তমানে তাঁদের দ্বারা পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের অতিরঞ্জিত রিপোর্ট দিয়ে পিকিং নেতৃত্বকে ভুল পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করছেন।

এই অন্ধ অনুকরণের দ্বারা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন শুধু যে ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে তাই নয়, এর দ্বারা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বকেও যেমন তাঁরা বারে বারে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করেছেন, অন্যদিকে যে কমিউনিজমকে একদিন এদেশের মানুষ একটা মহান আদর্শ হিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত, এই ধরনের আচরণের দ্বারা, অন্যান্য ত্রুটিগুলির কথা আমি পরে বলব, এঁরা এতবড় একটা মহান আদর্শের ইজ্জত ও সম্মান জনসাধারণের চোখে পূর্বের তুলনায় অনেক নামিয়ে দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব, যাঁদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মানুষমাত্রই, শোষিত মানুষমাত্রই, বুদ্ধিজীবী

মাত্রই শ্রদ্ধায় একদিন মাথা অবনত করতেন, সেই আন্তর্জাতিক নেতাদের প্রতি উচ্চ ধারণাকেও এদেশে হেয় করে তুলেছেন এবং ক্রমেই আরও হেয় করে তুলছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতাদের সম্পর্কে সেই উচ্চ ধারণা আজ এদেশে ক্রমেই হেয় হয়ে যাওয়ার জন্য যে সম্পূর্ণ দায়ী তথাকথিত এইসব কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অন্ধ আচরণ ও চাটুকারবৃত্তি — এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যদিও বুদ্ধিজীবীদের কথা বললেই এঁরা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'এরা তো পেটিবুর্জোয়া — এরা কী বলল না বলল, তাতে কী আসে যায়? শ্রমিক-চাষী তো আজও এদেশে এঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে।' আমি বলি, ঠিকমত তুলে ধরতে পারলে শ্রমিক-চাষী দেখে একথা ঠিক, কিন্তু আমাদের দেশের বেশিরভাগ শ্রমিক-চাষী আজও জানেই না খুব ভাল করে কে মার্কস, কে এঙ্গেলস, কে লেনিন এবং কে মাও সে-তুঙ। আজও এদেশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরাই, শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের আমরা সাধারণ মানুষরাই কমিউনিস্ট হচ্ছি দলে দলে। সত্যিকারের শ্রমিক এবং চাষীর রাজনৈতিক বিপ্লবী সংগঠন এবং নেতৃত্ব কি আজও এদেশে গড়ে উঠেছে? গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে মাত্র। তাহলে, এসব কথা বলার মানে হচ্ছে সত্যিকারের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া। ফলে, শহর এবং গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের, যাঁরা নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ, তাঁদের চোখে যদি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতারা শ্রদ্ধার আসন থেকে নেমে গিয়ে থাকেন, তাহলে আমি বলব, সেটা বর্তমান সময়ে একটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় এবং এর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ঐ সমস্ত চাটুকারদেরই নিতে হবে।

সঠিক বিপ্লবী দল ছাড়া বিপ্লব সফল হতে পারে না

ফলে, এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটির জন্মের পর থেকে সংগ্রামের ইতিহাস, অর্থাৎ সংগ্রাম পরিচালনার কায়দা ও পরিচালনার সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে এবং দেশের মূল রাজনৈতিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করবার জন্য এই পার্টিটি যতবার মূল রণনীতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ মূল বিপ্লবী তত্ত্ব গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবং দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাত্যহিক আচরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত মান, যা নিয়ে পরে বিশদভাবে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব, সে সমস্ত বিষয় লক্ষ করে — এই দলটি যে গঠনের শুরু থেকেই কমিউনিজমের তক্‌মা এঁটে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির মতো আচরণ করে এসেছে — এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই কেবলমাত্র আমরা ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী দল, অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তুলেছি। কারণ, মার্কসবাদ অনুযায়ী আমরা জানি, দল শুধুমাত্র কতগুলো ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে কোন রাজনৈতিক দলই কোন না কোন শ্রেণীর দল। অর্থাৎ উৎপাদনের বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে একটি দেশে যে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব বর্তমান থাকে তার কোন না কোন একটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শগত ও নৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার রাজনৈতিক অস্ত্রই হচ্ছে সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক দল। তাহলে, দল বলতে মার্কসবাদীরা বুঝে থাকে শ্রেণী দল যা একটা বিশেষ শ্রেণীগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চিন্তাগত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ওপরেই গড়ে উঠে, সে সম্বন্ধে দলের নেতা ও কর্মীরা সচেতন থাক বা না থাক, যেটা দলকে এবং দলের মূল বিচার-বিশ্লেষণকে এবং দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক আচরণের সংস্কৃতিগত ও রুচিগত দিকটিকেও প্রভাবিত করে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, একটি দেশে একটিই সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গড়ে উঠতে পারে, একাধিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল থাকতে পারে না। যদি দেশের দুই প্রান্তে দু'টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, তাহলে দু'জনেরই মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য এক হওয়ার জন্য তারা উভয়েই মিলিত হয়ে গিয়ে একটি পার্টি গড়ে তুলবে। কমিউনিস্ট পার্টি নামে দেশের অভ্যন্তরে একটি পার্টি থাকা সত্ত্বেও সাম্যবাদের আদর্শে অপর একটি পার্টি গঠনের যৌক্তিকতা একমাত্র তখনই বর্তায় যদি ইতিহাস ও দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে দেখা যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টি নামে সেই বিশেষ দলটি শ্রমিকশ্রেণীর নামের আড়ালে আসলে পেটিবুর্জোয়া বা বুর্জোয়া স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলেছে। সুতরাং, ভারতবর্ষে যে আট-ন'টি দল প্রত্যেকেই

নিজেকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল বলে জাহির করছে, নিজেদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে প্রচার করছে, এদের প্রতিটিই কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারে না। তাহলে, হয় এদের মধ্যে যে কোনও একটি পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি, অথবা এদের কোনটিই নয়। যদি এদের মধ্যে কোন একটি দল সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল থেকে থাকে, আমাদের সেটিকে ইতিহাস ও সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে চিনে নিতে হবে।

আর, যদি সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যায়, দেশে এখনও সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গড়েই ওঠেনি, তাহলে যাঁরা বিপ্লব চান, যাঁরা বর্তমান অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সামাজিক অবিচার এবং সাংস্কৃতিক সংকটের হাত থেকে মুক্তি চান, শোষিত শ্রেণীগুলিকে তথা দেশকে মুক্তি দিতে চান, তাঁদের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হবে। কেননা, আজকের দিনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল ছাড়া একটি দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলা যায় না, তাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না এবং বিপ্লবের পর তাকে সংহত করে শেষপর্যন্ত শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজও গড়ে তোলা যায় না। ফলে, ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য, যে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাটি আমাদের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আমাদের বিকাশের পথটিকে, সমাজের অপ্রতিহত অগ্রগতির পথটিকেই রুদ্ধ করে বসে আছে তাকে ভেঙে ফেলে সমাজের অবাধ বিকাশের পথটিকে খুলে দেবার জন্য বিপ্লব আমাদের চাই এবং এই বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী দলও আমাদের চাই। আর, হাজারো রকমের বিপ্লবী(!) তত্ত্ব এবং প্রচারের ডামাডোলের ভিতর থেকেই, কাজটি যত কঠিন হোক না কেন, সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি কোন্‌টি, সেটি আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

বিপ্লবী দল বিচারের সঠিক পদ্ধতি

এখন, একটি দল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল কি দল নয় — এই জটিল বিচারটি করব আমরা কিসের সাহায্যে? সে কি দলের নেতাদের গরম গরম বিপ্লবী বুলি দিয়ে? তাহলে তো সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর দল বিচারের কোন উপায়ই থাকবে না। কারণ, বিপ্লবী বুলি আওড়াতে তো কেউই আমরা পিছিয়ে নেই। লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না এবং এই জন্যই একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে না। লেনিন যখন বলেছেন বিপ্লবী তত্ত্ব, তখন তিনি একটি দলের শুধু রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং পলিসি বোঝাতে চাননি, তিনি বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-অর্ডিনেট (সংযোজিত) করে একটি পুরো জ্ঞানের পরিমন্ডলকেই (epistemological category) বুঝিয়েছেন।

তাহলে, কোন দল বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমত, দলটির বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে বিচার করে দেখতে হবে। দেখতে হবে, যে রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে তারা বিপ্লবী বলে প্রচার করছে তা আসলে বিপ্লবী কি না। অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী তত্ত্বটি আমাদের সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিপ্লবের যে জটিল প্রক্রিয়াটি চালু রয়েছে তার যথার্থ ও বাস্তব প্রতিফলন কিনা। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে, দলটির আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব কোন বিশ্লেষণ আছে কি নেই এবং যদি থাকে তাহলে সেটি যথার্থ মার্কসবাদসম্মত বিশ্লেষণ কি না। তৃতীয়ত, এগুলো দেখার সাথে সাথে দল বিচারের ক্ষেত্রে আরও দেখতে হবে, প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই দলের বিচারধারা (methodological approach) কী এবং দলের মূল রণনীতি, প্ল্যান, প্রোগ্রাম এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল কোন্ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং চতুর্থত দেখতে হবে, সেই দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণ এবং চলবার রীতিনীতি কোন্ শ্রেণীর সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে। এখানে মনে রাখতে হবে, নেতা ও কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ও জনতার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও যুক্তিহীন আচরণে প্রশ্রয়দান, নানা বুর্জোয়া কুসংস্কারের প্রভাব, অন্ধতা, একগুঁয়েমি, উচ্ছৃঙ্খলতা, হামবড়া ভাব, মিথ্যা বলার অভ্যাস — এগুলো থাকলে বুঝতে হবে, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান।

তাহলে দেখা গেল, দল বিচারের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যেমন পার্টির বিপ্লবী তত্ত্বকে প্রথমে বিচার করতে হবে, তেমনি সাথে সাথে সেই দলের চিন্তা ও বিচার পদ্ধতি এবং দলের নেতা ও কর্মীদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে সংস্কৃতিগত মান যা তাঁরা প্রতিফলিত করছেন, তাকেও বিচার করে দল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ

থেকে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান, অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করা ব্যতিরেকে এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রয়োগও সঠিক হতে পারে না। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও-এর মূল বিচারধারা সম্পর্কে যাঁরা জানেন, তাঁরাই আমাদের একথা বুঝতে সক্ষম হবেন। **এখানে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ ছাড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে শুধুমাত্র বই পড়া জ্ঞান, অথবা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সংযোজন ছাড়া শুধুমাত্র শোষিত মানুষের আন্দোলনগুলি পরিচালনার মধ্য দিয়ে অর্জিত যে জ্ঞান — এই দুটোই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান মাত্র।** সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই জানেন, এই দুটোকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত করতে পারলেই কেবলমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক তত্ত্বের ধারণা অর্জন করা সম্ভব। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে না পারলে এ দুটো আংশিক জ্ঞানকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে সংযোজন করে চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, অর্থাৎ তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতা অর্জন করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। এই দিকগুলি সম্পর্কে খেয়াল রেখেই দল বিচারের দুরূহ কাজটি আমাদের সম্পন্ন করতে হবে।

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও দল বিচারের সময় খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে, পার্টিটি কী পদ্ধতিতে, কোন্ ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং তার নেতৃত্ব সম্বন্ধে ধারণাটি কী? সেটি কি পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির মতই আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক (formal democratic) নেতৃত্বের ধারণা, নাকি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্র ও একেন্দ্রীকরণের নীতির সংমিশ্রণের মারফত গড়ে ওঠা সেটি একটি যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, বুর্জোয়া বিপ্লব যেহেতু উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং এক অর্থে ব্যক্তির বিকাশ ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু বুর্জোয়া গণতন্ত্র, তা যত আদর্শস্থানীয় (model) গণতান্ত্রিক ফর্মেরই হোক্ না কেন, সেখানে গণতান্ত্রিক ফর্ম-এর মধ্য দিয়ে আসলে ব্যক্তিনেতৃত্বই কাজ করে থাকে। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিই হল কেন্দ্রবিন্দু এবং এ সম্বন্ধে সচেতন উপলব্ধি না থাকলেও বাস্তবে এক ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রক্রিয়াটি গড়ে ওঠে। ফলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আসলে গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তিনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এই গণতন্ত্রের চরিত্র হয়ে পড়ে 'ফর্মাল'। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে উৎপাদনের ওপর যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রে নেতৃত্বের ধারণা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা।

যৌথ নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায়

এই যৌথ নেতৃত্বের ধারণা বলতে কী বোঝায়? লেনিন বলেছেন, দলের সকল সদস্যের যৌথ জ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। অর্থাৎ শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েই নয়, জীবনের প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে পার্টির সমস্ত সভ্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেই যৌথজ্ঞানের বিশেষীকৃত রূপে (concrete form) প্রকাশ হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ওপর আলোচনায় আমি এটাকে আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলেছি, এ যুগে কোন একটি দল আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটিয়ে একমাত্র তখনই এই যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, যখন পার্টির সমস্ত নেতা ও কর্মীর চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেটার ব্যক্তিকরণ ও বিশেষীকৃত প্রকাশ ঘটেছে, অর্থাৎ একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথ নেতৃত্বের সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। কারণ, দলের নেতা ও কর্মীদের চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান দলের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে সেই নেতৃত্ব, অর্থাৎ 'অথরিটি'র ধারণা, কোনমতেই বিমূর্ত (abstract) হতে পারে না। আর, এইজন্যই যৌথ নেতৃত্বের অভ্যুত্থান ঘটেছে একথার বাস্তব প্রমাণ হল যে, সেক্ষেত্রে কোন না কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ (personification) ঘটেছে।

বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করে বললে আপনাদের পক্ষে বোঝা সুবিধা হবে। ধরুন, আপনি-আমি যে চিন্তা করি, যাকে আমরা ব্যক্তিচিন্তা বলি, সেটা কী? একজন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সামাজিক চিন্তার যেভাবে ব্যক্তিকরণ ঘটে, তাকেই আমরা ব্যক্তিচিন্তা বলি। ঠিক তেমনিই পার্টির নেতা, কর্মী, সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের ও শ্রমিকশ্রেণী এবং জনসাধারণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্ম নিচ্ছে, সংগ্রামের

মধ্যে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকের মধ্যেই সেই চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ব্যক্তিকরণ ঘটছে। কিন্তু, যেহেতু আমরা জানি, এই বস্তুজগতে কোন দুটো বিষয় (phenomenon) একেবারে হুবহু এক হতে পারে না, সেই একই কারণে পার্টির সমস্ত সভ্য ও নেতাদের সম্মিলিত সংগ্রামের দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপলব্ধি সকলের মধ্যে এক হতে পারে না। যার মধ্য দিয়ে এই যৌথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটে, তিনিই যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ হিসাবে দেখা দেন। রাশিয়ান বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লেনিন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মাও সে-তুঙ-এর অভ্যুত্থান সেই সমস্ত পার্টিগুলিতে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যৌথ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে মানে হচ্ছে, দলের সমস্ত নেতা ও কর্মী, র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল, শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, দলের সর্বোচ্চ কমিটির কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। দলের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে যখন এইভাবে সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ হয়, নেতৃত্বের বিকাশের একমাত্র সেই স্তরেই দলের অভ্যন্তরে 'গ্রুপইজম' এবং নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে খতম করা সম্ভব এবং দলের অভ্যন্তরে এই অবস্থার উদ্ভব হলেই একমাত্র বলা চলে যে, দলটি প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করতে এবং যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মনে রাখতে হবে, দলটির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতির দোহাই পেড়ে ও যৌথ নেতৃত্বের নামে আসলে আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক নেতৃত্বই কাজ করে চলেছে।

এই যৌথজ্ঞান বলতে শুধুমাত্র অর্থনীতিগত বা রাজনীতিগত ধ্যানধারণাগুলিকেই বোঝায় না, জীবনের সর্বস্তরে — অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক সম্পর্ক পর্যন্ত ব্যক্তিগত ধারণা ও আচরণের সমস্ত স্তরে — একটি সংযোজিত এবং সামগ্রিক (co-ordinated and comprehensive) ধারণাকে বুঝিয়ে থাকে। পার্টি কর্মী ও নেতাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, সেটাই পথনির্দেশ হিসাবে প্রতিটি কর্মী ও নেতার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ধ্যানধারণা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার, এই যৌথজ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বাস্তবে সামাজিক জীবনে তাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নেতা ও কর্মীর অভিজ্ঞতার সাথে যৌথজ্ঞানের যে প্রতিনিয়ত সংঘাত ঘটে, তার দ্বারা আবার এই যৌথজ্ঞান সমৃদ্ধ হয় এবং নেতা ও কর্মীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও রুচির মানও ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে।

মনে রাখতে হবে, পার্টির অভ্যন্তরে নেতা ও কর্মীদের পরস্পর সম্বন্ধ দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির এই সম্পর্কের দ্বারা পরিচালিত না হলেই সে সম্পর্কের চরিত্র হয়ে পড়ে যান্ত্রিক। এবং এই অবস্থা পার্টির মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে, পার্টির অভ্যন্তরে ব্যক্তিবাদকে খতম করা দূরের কথা, বরং ব্যক্তিবাদ পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে কাজ করে চলেছে এবং এই অবস্থায় পার্টিটি নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া পার্টির মতই আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার সংমিশ্রণে কার্যত যান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক উপায়ে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবীরূপে পার্টির উচ্চস্তরে ব্যুরোক্রেটিক নেতৃত্বের জন্ম হয়ে থাকে। ফলে, এই অবস্থায় পার্টি নেতাদের মধ্যে বিপ্লবী রাজনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তে শুধু যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে ওঠে তাই নয়, পার্টি নেতারা নিকৃষ্ট ধরনের ব্যক্তিবাদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হন এবং পার্টিটি কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার একদিকে থাকে আমলাতান্ত্রিক এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত একদল নেতা ও তাত্ত্বিক, অন্যদিকে কর্মীদের মধ্যে অন্ধতা ও অন্ধ আনুগত্যের ফলে থাকে অন্ধভাবে অনুসরণকারী সৎ, ডেডিকেটেড, নিষ্ঠাবান অথচ উগ্র কর্মীর দল। ফলে বুঝতে পারছেন, এই অবস্থায় পার্টির অভ্যন্তরে তত্ত্ব এবং কর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে না। ফলে তত্ত্ব হয়ে পড়ে মনগড়া এবং বাস্তববিবর্জিত (abstract), আর কার্যকলাপ হয়ে পড়ে অন্ধ ও উগ্র ধরনের। এখন, সি পি আই, সি পি আই (এম) এবং নকশালপন্থী গ্রুপগুলির কার্যকলাপ, সংগঠনপদ্ধতি, কর্মীদের চেতনার মান প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, ঠিক এই অবস্থাই এদের সকলের মধ্যে বর্তমান।

গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ — যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রামের ভিত্তি

এই যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রামটিই হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কাঠামোটি

গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে তোলার মূল সংগ্রাম। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি পার্টির মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এরূপ ধারণা না গড়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে হবে, পার্টিটির আভ্যন্তরীণ কাঠামোটিও গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। আপনাদের মনে রাখতে হবে, এই গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতিই হল কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের আসল প্রাণসত্তা। এই গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ গড়ে তোলার সংগ্রাম যেমন সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম, আবার একে চোখের মণির মতো রক্ষা করার সংগ্রামও তেমনি পার্টিকে সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের হাত থেকে রক্ষা করার সংগ্রাম। এখন, এই গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ বলতে আমরা কী বুঝি?

গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণকে যদি আমরা 'এ্যানাটমি'র মত কেটে ভাগ করি, তবে দু'টো ভাগ পাব। একটা হচ্ছে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা, আর একটা হচ্ছে সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা। এই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা পার্টির অভ্যন্তরে একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে ভিত্তি করে, শুধু অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে 'ওয়ান প্রসেস্ অফ্ থিংকিং', 'ইউনিফর্মিটি অফ্ থিংকিং', 'ওয়াননেস ইন এ্যাপ্রোচ' এবং 'সিঙ্গলনেস্ অফ্ পারপাস' (সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা, সম-উদ্দেশ্যমুখীনতা) গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। এ জিনিস গড়ে তুলতে পারলেই পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রোলেটারিয়ান গণতান্ত্রিক নীতি চালু হয়েছে বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই গণতন্ত্রের ধারণাও দু'ধরনের। একটা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যা ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত অধিকার এবং বুর্জোয়া জীবনযাত্রা, অর্থাৎ ব্যক্তিবাদকে প্রতিফলিত করছে। আর একটা হচ্ছে সর্বহারা গণতন্ত্র যা যৌথ মালিকানা, উৎপাদন এবং বন্টনের ওপর যৌথ কর্তৃত্ব এবং সর্বহারা জীবনযাত্রা, অর্থাৎ যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে প্রতিফলিত করছে। এই আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ যা দলের মধ্যে কার্যকরীভাবে সর্বহারা গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করে, তার ভিত্তিতে দলের সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে উঠলেই তবে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের কাঠামোটি গড়ে উঠতে পারে। এইজন্যই লেনিন গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, সর্বহারা গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মিশ্রণের মধ্য দিয়েই একমাত্র গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতি দলের অভ্যন্তরে চালু করা সম্ভব।

এখানে একটা কথা কোনমতেই ভুলে গেলে চলবে না যে, পার্টির অভ্যন্তরে সর্বহারা গণতন্ত্র চালু করার বাস্তব অবস্থা একমাত্র তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন পার্টি কর্মীদের চেতনার মান এমন একটা ন্যূনতম উচ্চস্তরে পৌঁছেছে, যে স্তরে পৌঁছলে সমস্ত কর্মীই, অন্তত বেশিরভাগ কর্মী তাদের চিন্তাকে স্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম, অর্থাৎ মতবিনিময়ের (in the form of dialogue) মাধ্যমে তারা পার্টির অভ্যন্তরে তর্কবিতর্ক এবং আদর্শগত সংগ্রামে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে এরূপ ন্যূনতম ক্ষমতা অর্জনের প্রধান শর্ত হচ্ছে, বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কর্মীদের উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্জন। এটা সম্ভব হলেই একমাত্র নেতাদের সাথে পার্টি কর্মীদের তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রাম যথার্থই বাস্তবে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের রূপ নিতে পারে। কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মান এমন একটা ন্যূনতম উচ্চস্তরে না পৌঁছালে নেতা ও কর্মীদের আদর্শগত আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক কার্যত আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে। এইবার ভেবে দেখুন, এই সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলগুলিতে, সর্বহারা গণতন্ত্রের যে রূপটির কথা আমি আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করলাম, তা যথার্থই বাস্তবে আছে কিনা। অথচ, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য এবং দলের তাত্ত্বিক বলে পরিচিত নেতা নাম্বুদিরিপাদ কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের প্রাণবস্তু গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের এই তত্ত্বটিকেই একটি নিছক 'মেজরিটি-মাইনরিটি'র তত্ত্বে দাঁড় করিয়েছেন এবং পার্টির অপরাপর নেতা ও কর্মীরাও বিনা প্রতিবাদে এই ব্যাখ্যাটিই মেনে নিয়েছেন।

গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাম্বুদিরিপাদ বলেছেন, তাঁদের পার্টি যেহেতু 'মেজরিটি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে এবং উচ্চতর পার্টি সংগঠনের কাছে নিম্নতর পার্টি সংগঠনের আনুগত্যের নীতি মেনে কাজ করে, সুতরাং তাঁদের পার্টি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতি মেনে কাজ করছে এবং এই কারণেই নাকি তাঁদের পার্টি একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি।[১] মেজরিটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করাকেই নাম্বুদিরিপাদ বলেছেন গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতি পার্টির অভ্যন্তরে চালু হওয়া ও যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং এইভাবেই যৌথনেতৃত্বের ধারণাকে তাঁরা একটি গড়পড়তা আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে (average formal democratic leadership) পর্যবসিত করেছেন। এই মেজরিটি সিদ্ধান্ত মেনে চলার নীতি তো সমস্ত

বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির মধ্যেও আছে। তাহলে কি বুঝতে হবে, বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির মধ্যেও গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতি কাজ করছে এবং যৌথ নেতৃত্ব চালু রয়েছে? ঐক্যে পৌঁছান সম্ভব না হলে একটি কমিউনিস্ট পার্টিতেও অনেক সময়েই প্রয়োজনে মেজরিটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে হয় এবং মাইনরিটিকে সেই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হয়। কিন্তু একটা পার্টির অভ্যন্তরে এটা থাকলেই 'গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে' — একথা বলা চলে না। গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতির প্রশ্নটি যে সর্বহারা গণতন্ত্র ও যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একথা যে কোনও মার্কসবাদী জানেন। কাজেই শুধুমাত্র মেজরিটি সিদ্ধান্ত মেনে চলা এবং 'হায়ার বডি'র কাছে 'লোয়ার বডি'র আনুগত্য হলেই দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের নীতি চালু হয়েছে — একথা কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কোন মার্কসবাদীই বলতে পারেন না।

তাহলে, কোন দল যৌথ নেতৃত্বের ধারণার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা বিচার করতে হলে দেখতে হবে, প্রথমত, এই যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার এবং বিকাশ ঘটাবার জন্য মার্কসবাদকে ভিত্তি করে দলের অভ্যন্তরে সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা শুধুমাত্র রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে গড়ে উঠেছে কিনা, অর্থাৎ আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে উঠেছে কিনা, এবং সম-বিচারধারা ও সম-উদ্দেশ্যমুখীনতা গড়ে তোলার সংগ্রামটি দলের অভ্যন্তরে সঠিক ও সচেতনভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা।

দ্বিতীয়ত দেখতে হবে, শৃঙ্খলা ও সম-বিচারধারা গড়ে তোলার দোহাই পেড়ে দলের নেতারা কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামিরই অনুরূপ দলীয় গোঁড়ামি ও অন্ধ আনুগত্যের মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, নাকি দলের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে গোঁড়ামি ও যুক্তিহীন আচরণ, নানাপ্রকার বুর্জোয়া কুসংস্কারের প্রভাব, অন্ধতা, একগুঁয়েমি, উচ্ছৃঙ্খলতা, হামবড়া ভাব, মিথ্যা বলার অভ্যাস প্রভৃতি আচরণ ও অভ্যাসগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরের কথা, নেতৃত্ব কর্তৃক এগুলোর বিরুদ্ধে সমস্ত দিক থেকে কার্যকরীভাবে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করে দলের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ এবং বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে তোলার একটা নিয়ত প্রচেষ্টা চলছে। কারণ, কমিউনিস্টদের একথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও অন্ধতা হচ্ছে ফ্যাসিবাদের পরিপূরক এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঘোরতর পরিপন্থী।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এবং তার অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক (মার্কসবাদী) দলগুলি শোধনবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী (national chauvinist) হয়ে যাবার পর এই সমস্ত পার্টিগুলির মধ্যে যারা ঢিলেঢালা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছিল, তারা ফ্যাসিবাদের জন্ম দিতে পারেনি। বরং যে সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে এই অন্ধতা ও গোঁড়ামি জঙ্গি (militant) রূপ গ্রহণ করেছিল, তারাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছিল। **সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির চরিত্র এ যুগে পুরোপুরি উন্মোচিত (exposed) হয়ে যাওয়ার পর এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে আজ যেসব কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই শোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে এবং এদের মধ্যে যারা দেশে দেশে ক্রমেই জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রূপ পরিগ্রহ করছে (অর্থাৎ নামে কমিউনিস্ট পার্টি হলেও কার্যত সমস্ত দিক থেকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চরিত্র নিয়ে নিয়েছে) সেইসব পার্টিগুলির মধ্যে অন্ধতা ও গোঁড়ামির সাথে যদি উগ্র জঙ্গি চরিত্র যুক্ত হয়, তাহলে মার্কসবাদের ঝান্ডা উড়িয়েই এই সমস্ত পার্টিগুলির এ যুগে ফ্যাসিবাদী পার্টিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় বর্তমান। কারণ, বিপ্লবী তত্ত্বের প্রভাবে প্রভাবিত সংগ্রামের জঙ্গি চরিত্র আর অন্ধতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে ভিত্তি করে সংগ্রামের উগ্র জঙ্গিয়ানা এক জিনিস নয় — এই দুটো মূলগতভাবে ভিন্ন চরিত্রের।**

শ্রমিকশ্রেণীর দলের সাংগঠনিক কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ দেবার পূর্বে অবশ্যকরণীয় তিনটি কাজ

এছাড়া দল বিচারের ক্ষেত্রে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, দলটি কী ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং দলটির সাংগঠনিক কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ দেবার পূর্বে শ্রমিকশ্রেণীর দল গঠনের প্রাথমিক কাজগুলি পূরণ করার জন্য দলের নেতৃত্ব কর্তৃক কঠোর এবং কষ্টসহিষ্ণু সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে কিনা।

১৯৬৪ সালে সি পি আই থেকে বেরিয়ে এসে কিছু নেতা যখন সি পি আই (এম) গড়ে তোলেন, কলকাতায় তাঁদের সেই সপ্তম কংগ্রেসের আগে তাঁদের কলকাতা জেলার একটি গ্রুপ আমার সাথে দেখা করে। আমি তাঁদের বলেছিলাম, একটা নতুন দল গড়ার আগে আপনাদের দেখা দরকার দেশে কোন সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে তাকেই শক্তিশালী করতে হবে। আর, আপনাদের বিচারে যদি দেশে সেরকম পার্টি না থেকে থাকে, তাহলে পার্টিকে সংবিধানসম্মত চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেবার পূর্বে সঠিক মার্কসবাদী পদ্ধতিতে পার্টি গড়ার প্রাথমিক কাজগুলি আপনাদের সম্পন্ন করতে হবে। তা নাহলে যে পার্টি থেকে আপনারা বেরিয়ে এসেছেন, চিন্তাপ্রক্রিয়ায় সেই একই 'ট্র্যাডিশন' নতুন নাম ও নতুন নতুন বাকচাতুর্যের আড়ালে আপনারা বহন করে চলবেন। এখন, একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সেই প্রাথমিক কাজগুলি কী?

প্রথমত, যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে জড়িত করে, একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তুলে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের বুনিয়াদ স্থাপনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে, যৌথ নেতৃত্বের বাস্তব ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। তাই চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ, সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা ও সম-উদ্দেশ্যমুখীনতা গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের এই বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণাটি দলের মধ্যে গড়ে তোলাই সম্ভব নয়, এবং যতদিন পর্যন্ত যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন সেই সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এই বিশেষীকৃত ধারণার জন্ম না হয়, মনে রাখতে হবে, ততদিন পর্যন্ত দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেবার সময় আসেনি। কারণ, এরূপ অবস্থায় দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দিতে গেলে দলটি গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টির বদলে যান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে পর্যবসিত হয় এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বদলে দলটি আনুষ্ঠানিক এবং ব্যুরোক্র্যাটিক নেতৃত্বের জন্ম দিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদল 'প্রফেশনাল রেভলিউশনারি'র (জাত বিপ্লবীর) জন্ম দিতে হবে। মার্কসবাদের পরিভাষায় এই প্রফেশনাল রেভলিউশনারি বলতে পয়সার বিনিময়ে হোলটাইম ওয়ার্কার বোঝায় না। এ সম্পর্কেও আপনাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। প্রফেশনাল রেভলিউশনারি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সচেতন অংশের সেই অংশ, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তাঁরা সবসময়ই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকী ব্যক্তিগত ব্যাপারেও, আনন্দের সাথে বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় 'সাবমিট' করতে সক্ষম। একমাত্র এই প্রফেশনাল রেভলিউশনারিদের মধ্য থেকেই যদি পার্টির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসে, তাহলেই একটি পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

মূলত এই তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামোর জন্ম দেওয়া যেতে পারে। এ না করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলের পুরো সাংগঠনিক কাঠামোর একটি চূড়ান্ত রূপ কখনই দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাথমিক তিনটি কাজ করতে পারলেই আপনারা যাঁরা সি পি আই থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়তে চাইছেন, সি পি আই-এর অ-শ্রমিকশ্রেণী চিন্তাপদ্ধতি ও বিচারধারা (non-working class methodological approach) যা আপনাদের চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যে সচেতন বা অসচেতনভাবে কাজ করছে, তার সাথে ছেদ টানতে আপনারা সক্ষম হবেন এবং সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে একটি সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তুলতে আপনারা সক্ষম হবেন। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তোলার এই প্রাথমিক সংগ্রামটি এড়িয়ে গিয়ে ওপর থেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বগুলি ভাসাভাসাভাবে গ্রহণ এবং তার স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে যদি কয়েকজন ব্যক্তি বা কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী সাততাড়াতাড়ি একটি পার্টি গঠন করে ফেলে, তাহলে বড় জোর

সেটি দৈনন্দিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হতে পারে — তা শ্রমিকশ্রেণীর জটিল বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার জন্য উপযুক্তভাবে শিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি কোনমতেই হতে পারে না। গোড়ায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সময়ে নেতারা এই প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করার কঠোর ও কষ্টসহিষ্ণু সংগ্রামটি পরিচালনা করেননি। ফলে, এই সংগ্রামটি না করে আবার একটা পার্টি কংগ্রেস, মানেই হচ্ছে, আবার বেশ কিছু কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও কয়েকটি রাজনৈতিক গ্রুপ-এর সাধারণভাবে গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে সম্মিলিত সংগ্রামের একটি প্ল্যাটফর্ম আপনারা গড়ে তুলবেন। ফলে, কিছু কিছু বিপ্লবী স্লোগানের আড়ালে শোধনবাদী ডাঙ্গে পার্টিরই অনুরূপ আর একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির আপনারা জন্ম দেবেন। এর দ্বারা সঠিক বিপ্লবী দল হবে না।

কেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি

অথচ, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা পার্টির গঠনের এই প্রাথমিক প্রক্রিয়াটি এবং কষ্টসহিষ্ণু ও কঠোর সংগ্রামটি, যেটা হলেই একমাত্র সি পি আই-এর সংশোধনবাদী ট্র্যাডিশন থেকে চিন্তাপদ্ধতিতে একটা ছেদ টানা সম্ভব হত, সেই সংগ্রামটি এড়িয়ে গিয়ে বিরাট জাঁকজমক করে কলকাতায় সপ্তম কংগ্রেস করলেন এবং সি পি আই-এর শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সেই ট্র্যাডিশনে গড়ে ওঠা পুরনো নেতা ও গ্রুপগুলিকে নিয়েই একই পুরনো ট্র্যাডিশান ও চিন্তাপদ্ধতি অনুসরণ করে এবং কতগুলো শব্দগত পার্থক্যের ও চাতুর্যের আড়ালে কৌশলগত আচরণের (tactical approach) ক্ষেত্রে পার্থক্য খাড়া করে তাকেই নতুন বিপ্লবী তত্ত্ব বলে চালিয়ে একটি নতুন পার্টি গড়ে তুললেন। আমি সেদিনই বলেছিলাম, এই পার্টিটিও আবার বিভক্ত হবে, এবং তিন বছরের মধ্যেই দেখুন, নকশালপন্থী নেতা ও কর্মীরা বেরিয়ে এসে আবার এদের নয়া সংশোধনবাদী বলছেন এবং আর একটি পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। আমি এই সভায় আবার বলে যাচ্ছি, নকশালপন্থী বলে যাঁরা সি পি আই(এম) থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁদেরও একই পরিণতি হবে এবং আশা করছি, দু'এক বছরের মধ্যেই আমার এ কথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হবে। একথা বলছি কী করে? সে কি জ্যোতিষ শাস্ত্র আয়ত্ত করে? না, একথা বলতে পারছি তিনটি জিনিস ব্যাখ্যা করে।

প্রথমটি হল, এ দলটির শ্রেণীচরিত্র ও দলটির চিন্তার প্রক্রিয়া ও বিচারধারা সেই পুরনো পার্টির ট্র্যাডিশনই বহন করছে। দ্বিতীয়টি হল, এ দলটির ভুল তত্ত্ব। বিপ্লবের যে যথার্থ বাস্তব জটিল প্রক্রিয়াটি দেশের অভ্যন্তরে চলছে, তাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝার চেষ্টা না করে মনগড়া পথে, অর্থাৎ বিদেশের পার্টি এবং বিদেশি নেতাদের অন্ধ অনুকরণ করে, ওপর থেকে মনগড়া কতগুলো তত্ত্ব বিপ্লবী তত্ত্বের নামে সেই বাস্তব অবস্থার ওপর চাপিয়ে দিয়ে, আর জনসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে গরম কিছু লড়াই পরিচালনা করে একটি যথার্থ বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দল গড়ে উঠতে পারে না। 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র যে তত্ত্বটি তাঁরা দাঁড় করিয়েছেন, তা ভারতবর্ষের বিপ্লবের জটিল প্রক্রিয়ার বাস্তব প্রতিফলন নয় বলে এবং বিপ্লবের বাস্তব অবস্থানের ওপর তা একটি চাপানো মনগড়া তত্ত্ব হওয়ার ফলে এই তত্ত্বটি অবশ্যম্ভাবীরূপে দলের অভ্যন্তরে মূল দু'টি পরস্পরবিরোধী মানসিকতার জন্ম দিচ্ছে। পার্লামেন্টারি রাজনীতির মধ্যে চলতে গিয়ে দলের একটা 'স্টেবিলিটি' বা স্থিতিভাব যখনই গড়ে উঠছে, একদল নেতা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মন্ত্র জপতে জপতেই নানা বিপ্লবী বুক্‌নির আড়ালে পার্লামেন্টারি রাজনীতির বেড়াজালের মধ্যেই দলকে আটকে ফেলতে চাইছেন। অন্যদিকে আর এক দল, যাঁরা এই পার্লামেন্টারি রাজনীতির সুবিধাবাদে উত্যক্ত হয়ে উঠছেন এবং বিপ্লবের জন্য যাঁদের মধ্যে একটা আকুলতা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে আবার পার্টির চিন্তাপদ্ধতি সঠিক নয় বলে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বটি বিপ্লবের বাস্তব অবস্থার যথার্থ প্রতিফলন নয় বলে, অর্থাৎ ভুল তত্ত্ব হওয়ার ফলে, অতিবিপ্লবী ঝোঁক দেখা দিচ্ছে এবং এর ফলে তাঁরা অসময়ে বিপ্লবী শক্তিকে রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের মুখে ঠেলে দিয়ে বিপ্লবেরই ক্ষতি করছেন এবং রাষ্ট্রের দমননীতিকে শক্তিশালী হতে কার্যত সাহায্য করছেন।

তৃতীয়টি হচ্ছে, দলটির অভ্যন্তরে ব্যক্তিবাদের প্রভাব ও গ্রুপ মানসিকতা, যা হল পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীদলের বৈশিষ্ট্য, যার জন্য সি পি আই বিভক্ত হ'ল, এ দলটিও গ্রুপ-এর সেই পুরনো বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্ম নিয়েছে। ফলে, যতদিন এই গ্রুপগুলি পরস্পর পরস্পরকে মানিয়ে চলতে পারবে, ততদিন দলটির জোড়াতালি দিয়ে ঐক্যও বজায় থাকবে। কিন্তু যে মুহূর্তে এদের বোঝাপড়া ভেঙে যাবে সেই মুহূর্তেই পার্টি আবার বিভক্ত হবে। আর, একই নিয়মে পুরনো পদ্ধতিতে চিন্তা, ব্যক্তিবাদী ঝোঁক ও গ্রুপ মানসিকতা এবং

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, যা বিপ্লবের যথার্থ অবস্থানের ওপর একটি মনগড়া তত্ত্ব — এই তিনটি কারণ বর্তমান থাকলে পার্টি যত ভাগই হোক্, তার প্রত্যেকটি ভাগই আবার শেষপর্যন্ত দুটো ভাগে বিভক্ত হবে। একটা ঝোঁক ধীরে ধীরে নানা যুক্তি খাড়া করে পার্লামেন্টারি রাজনীতির দিকে আসতে চাইবে এবং শেষ পর্যন্ত পার্টিকে পার্লামেন্টারি রাজনীতির মধ্যে আটকে ফেলবে এবং অন্য আর একটি ঝোঁক অতি-বিপ্লবীয়ানার (adventure) দিকে পা বাড়াবে।

সি পি আই (এম) গড়ে ওঠার সাথে সাথে একই নিয়মে সে বিভক্ত হয়েছে। নকশালপন্থীরা পার্টি গড়লেও ঐ একই ভবিষ্যৎ। কেননা, তারাও গ্রুপ নিয়েই গড়ে উঠছে এবং তাদের তত্ত্বটিও ঐ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মতই 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্ব। এদের নতুন পার্টি গড়ার মানে হল, একটি বা কয়েকটি গ্রুপের বিরুদ্ধে আর কিছু গ্রুপের সমন্বয়। এর সাথে নতুন করে একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সম্পর্ক কোথায়? এ তো সেই একই রাজনৈতিক লাইন, একই চিন্তাপদ্ধতি, একই সাংস্কৃতিক মান — শুধুমাত্র রাজনৈতিক শব্দব্যবহার ও আচরণে, অর্থাৎ কৌশলগত ব্যাপারে কিছু অদলবদল ছাড়া।

একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে গ্রুপের অস্তিত্ব থাকতে পারে না

ফলে, মার্কসবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও যারা পার্টি গঠন করার জন্য আত্মনিয়োগ করল, তাদের মধ্যে সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা ও সম-উদ্দেশ্যমুখীনতা এবং যৌথ নেতৃত্বের মূর্ত ধারণা গড়ে তোলার দীর্ঘ ও জটিল সংগ্রামটি এড়িয়ে যাবার ফলে, যেটা আমি আগেই বলেছি, এই পার্টি কতগুলো পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সাধারণ গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে শুধুমাত্র 'রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্মে' পরিণত হয়েছে। কমিউনিস্ট হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও এই পার্টির নেতা ও বেশিরভাগ কর্মী তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে নিজের নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হন এবং নেতাদের বেশিরভাগই ব্যক্তিগত অহম্‌বোধ এবং বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ্‌দের অনুরূপ 'পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারিজম'-এর (রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার) এক একটি প্রতিমূর্তি। খবর নিলেই জানতে পারবেন, পার্টির মধ্যে এঁদের প্রত্যেকের এক একটি গ্রুপ আছে। যতক্ষণ এই গ্রুপগুলি পরস্পর আপস করে, মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে, ততক্ষণ পার্টিটিও ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু যখন সেটা সম্ভব হয় না, তখনই পার্টিটি বিভক্ত হয়ে গিয়ে আবার একটা আলাদা পার্টিতে পরিণত হয়। অথচ, গ্রুপের এই ঝগড়ার জন্য পার্টিটি যখনই আলাদা হয়ে যায়, সাধারণ মানুষ ও কর্মীদের কাছে তা আড়াল করে রাখার জন্য নেতারা সবসময়ই রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ধূয়া তুলে এটা করেন। নেতারা এসব সচেতনভাবে করেন কি করেন না, সেটা বড় কথা নয়। দলের মধ্যে ব্যক্তিবাদের প্রভাব প্রধান হয়ে দেখা দিলেই গ্রুপ মানসিকতা, উপদলীয় চক্রান্ত, নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বুর্জোয়া ভাবধারার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াগুলিও কার্যকরীভাবেই দলের মধ্যে বজায় থাকতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনাদের বলা দরকার বলে মনে করি। ভারতবর্ষের মতো একটি বহু উপজাতি (nationalities) অধ্যুষিত দেশে, যেখানে উপজাতি মানসিকতা জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান এবং গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে সমস্ত প্রকারের লড়াই চলা সত্ত্বেও আমার মতে যে মানসিকতা আরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে কাজ করবে, সেখানে শুধু ব্যক্তিবাদের প্রভাবই গ্রুপ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে তাই নয়, সর্বভারতীয় পার্টিগুলির মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ছাড়াও নেতা ও কর্মীদের মধ্যে উপজাতীয় মানসিকতার প্রভাব পার্টির অভ্যন্তরে গ্রুপ মনোভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করে থাকে। তাই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলার প্রশ্নটি পার্টির অভ্যন্তরে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা ও বজায় রাখা এবং ব্যক্তিবাদী ঝোঁক ও গ্রুপ রাজনীতিকে পরাস্ত করার একটি প্রধান শর্ত।

একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি — দলের মধ্যে গ্রুপ বা উপদলীয় মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে পারে না। কারণ, গ্রুপ মানেই হচ্ছে সমান্তরাল (parallel); আর, সমান্তরাল মানেই হচ্ছে পার্টির অভ্যন্তরে আলাদা আলাদা সমান্তরাল চিন্তাধারা যা একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির মধ্যেই সম্ভব হতে পারে। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে এ জিনিস চলতেই পারে না। বরং, একটি কমিউনিস্ট পার্টিতে গ্রুপ মনোভাব গড়ে ওঠার কারণগুলিকে দূর করার ব্যাপারে ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে প্রতিটি কর্মী ও নেতাকে মুক্ত করার জন্য পার্টির অভ্যন্তরে যে যৌথ ও সচেতন সংগ্রাম পরিচালিত হয়, তাকে প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত রাখতে হয়।

তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যে গ্রুপ আছে, তা নাম্বুদ্রিপাদও অস্বীকার করতে পারেননি। তবে কংগ্রেসের মধ্যে যে বিভিন্ন গ্রুপের দ্বন্দ্ব আছে তার সাথে নিজেদের দলের মধ্যে গ্রুপের অবস্থানের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপের দ্বন্দ্ব হচ্ছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ; আর তাদের মধ্যে যে গ্রুপ আছে, তা ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে ভিত্তিকে করে গড়ে ওঠেনি — তাঁর মতে তা গড়ে উঠেছে পার্টির অভ্যন্তরে চিন্তার বিভিন্ন ধারাকে (different trends of thinking) ভিত্তি করে। আরও ভাল কথা ! স্বপক্ষে যুক্তি করতে গিয়ে তিনি জানেন না যে, বাস্তবে একটি কঠোর সত্যকেই তিনি স্বীকার করে ফেলেছেন। যদিও আমি জানি, একথা তাঁরা স্বীকার করতে চাইবেন না, কিন্তু সত্যিকারের একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হলে এ তো তাঁর অজানা থাকার কথা নয় যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে চিন্তার 'বিভিন্ন ধারা' মানেই হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাধারা। একথা ঠিক, যেকোন একটা বিষয়কে ভিত্তি করে একটি বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অভ্যন্তরেও পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু সে পার্থক্য হচ্ছে একই বিচারধারা বা চিন্তাধারা, অর্থাৎ একই চিন্তাপ্রক্রিয়ার কাঠামোর মধ্যেই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব। একটি কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে এধরনের পার্থক্য বা দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব কোন অবস্থাতেই চিন্তা পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার অস্তিত্বকে বোঝায় না। অথচ, নাম্বুদ্রিপাদ বলছেন, তাঁদের মধ্যে যা পার্থক্য, তা চিন্তার বিভিন্ন ধারাকে প্রতিফলিত করছে। চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার প্রশ্নটি যে সরাসরি শ্রেণীগত চিন্তাপদ্ধতির সাথে জড়িত — একথা হয় তিনি জানেন না অথবা নিজেদের 'ডিফেন্ড' করার ঝোঁকে তাঁর খেয়াল ছিল না।

মনে রাখতে হবে, কমিউনিস্ট পার্টি একটি বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া পার্টির মত নিছক কতগুলি ব্যক্তি এবং গ্রুপ-এর সমষ্টি নয়। লেনিন একটি কমিউনিস্ট পার্টিকে জীবন্ত দেহের (living organism) সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ, কমিউনিস্ট পার্টি একটা 'মেকানিক্যাল হোল' না, এটা একটা 'অরগ্যানিক হোল' (প্রাণহীন যন্ত্র নয়, একটি জীবন্ত সত্তা) ঠিক যেমন মানবদেহ —এটা একটা 'মনোলিথিক অরগ্যানিজম', এর একটা স্নায়ু কেন্দ্র বা মস্তিষ্ক (centre of nerves or brain) আছে। জীবন্ত দেহের এটাই হল কেন্দ্রবিন্দু বা পরিচালিকা শক্তি। এই মস্তিষ্কই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পরিচালনা করে। আবার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলিও (sense organ) তাদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করছে। মস্তিষ্কের সাথে ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির এই সম্পর্কটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত। একটি কমিউনিস্ট পার্টির গঠনও এইরকম। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতার সাথে র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে সেল থেকে শুরু করে পার্টির অন্যান্য বডিগুলির সম্পর্ক হল মস্তিষ্কের সাথে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সম্পর্কের মতো। আবার নিচু থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই সকল পার্টিবডিগুলিও আলাদা আলাদাভাবে কতগুলো কর্মী বা নেতার সমাবেশ মাত্র নয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব নিজস্ব ক্ষেত্রে 'সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশান' বা নেতা আছে।

এই সমস্ত পার্টি বডিগুলি এবং সমস্ত কর্মী ও নেতার সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, আমি আগেই বলেছি, সেই যৌথজ্ঞানের ধারণা যেহেতু বিমূর্ত নয়, সেহেতু পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথজ্ঞানের প্রকাশ সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ নেয় — তিনি হচ্ছেন দলের চিন্তানায়ক, নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। এই নেতা বিভিন্ন নেতার মধ্যে চুক্তির দ্বারা, বা তাদের মধ্যে আপসের রূপে বা জোড়াতালি দিয়ে ঠিক হয় না। এই নেতা পার্টির অভ্যন্তরে যৌথ ও সচেতন সংগ্রাম, অর্থাৎ যৌথ নেতৃত্বের বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়। মনে রাখতে হবে, কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে 'লিডারশিপ'-এর এই 'ফেনোমেনন', 'প্যারালাল (সমান্তরাল) লীডারস্'-এর ফেনোমেনন নয়, এটা 'লিডার অব দি লিডারস্'-এর (নেতাদের মধ্যে নেতার) ফেনোমেনন। লেনিনের জীবদ্দশায় সি পি এস ইউ-তে লেনিন ছিলেন সকল নেতাদের নেতা। তিনিই ছিলেন দলের চিন্তানায়ক, নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। লেনিন যখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী, স্ট্যালিন পার্টির সাধারণ সম্পাদক, তখনও লেনিন ছিলেন দলের নেতা ও শিক্ষক। এটা স্ট্যালিনও মনেপ্রাণে স্বীকার করতেন। চীনের পার্টিতেও মাও সে-তুঙই দলের চিন্তানায়ক বা নেতা। একেই বলা হয় যৌথ নেতৃত্বের যথার্থ রূপ, অর্থাৎ যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ।

কিন্তু আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী এই পার্টিগুলির মধ্যে কোন্ পার্টিতে কে সেই লিডার অফ্ অল লিডারস্, যাঁকে সেই পার্টিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরাও এবং পার্টির অন্যান্য সকল নেতারাও

যথার্থভাবে পার্টির চিন্তানায়ক, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক বলে মনে করেন? বাস্তবে তাঁদের কেউই কারোর লিডার নয়। তাঁরা সকলেই লিডার। একই পার্টির অভ্যন্তরে তাঁদের প্রত্যেক নেতারই প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও নীতিগত বিরোধ আছে। এরূপ পরিস্থিতিতে দলের নিম্নতম পার্টিবডি, অর্থাৎ 'সেল' থেকে সুরু করে দলের উচ্চতম পার্টিসংগঠন কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত কোন পার্টিবডিই সত্যিকারের অর্থে 'অর্গানিজম'-এর রূপ নিতে পারে না। ফলে, এই অবস্থায় শুধু 'এক্সিজেন্সি'তে অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁরা একই পার্টির মধ্যে থেকে মেজরিটি সিদ্ধান্ত মেনে কোনমতে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যান। আর, একেই ওঁরা বলেন যৌথ নেতৃত্ব।

সংশোধনের দ্বারা একটি শ্রেণীর দলকে অপর একটি শ্রেণীর দলে রূপান্তরিত করা যায় না

এবারে আমি কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের নিজেদের আর একটি কথা দিয়ে তাঁদের পার্টির আসল চরিত্র আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছি। যোশী এবং রণদিভের নেতৃত্বের পর যখন অজয় ঘোষ পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন, তখন তিনি বললেন, তাঁদের পার্টি জন্মের পর থেকে তাঁর নেতৃত্বে আসা পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তা প্রতিফলিত করেনি। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এতদিন পর্যন্ত পার্টির চিন্তাধারায় শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়নি। সত্যভাষণের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় দিক। কিন্তু, এটা তো তাঁর বক্তব্যের 'নেগেটিভ' (নেতিবাচক) দিক মাত্র। তার 'পজিটিভ' (ইতিবাচক) দিকটি কী? যেকোন কমিউনিস্ট মাত্রই জানেন যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সমস্ত চিন্তাই কোন না কোন শ্রেণীস্বার্থকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শ্রেণীচিন্তা। অজয় ঘোষের কথায় পার্টি গঠনের পর থেকেই তাঁর নেতৃত্বে আসা পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪/২৫ বছর ধরে পার্টির চিন্তাধারায় শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়নি, অর্থাৎ পার্টির চিন্তা বা মতবাদ শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তা বা মতবাদ ছিল না। এখন, এই দীর্ঘ ২৪/২৫ বছর ধরে পার্টি যদি তার চিন্তাপদ্ধতি এবং বিচারপদ্ধতিতে শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তা ও শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নিশ্চয়ই তা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীচিন্তা বা বুর্জোয়া শ্রেণীচিন্তা হতে বাধ্য। অথচ, কথাটি স্বীকার করার মত সৎসাহস তাঁর ছিল না।

তাহলে, যে পার্টি জন্মের পর থেকে দীর্ঘ ২৪/২৫ বছর ধরে চিন্তায় এবং বিচারপদ্ধতিতে পেটিবুর্জোয়া বা বুর্জোয়া শ্রেণীচিন্তাকে প্রতিফলিত করে এল এবং বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া চিন্তাপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নিয়ে সংগ্রাম করে এল, সেই সংগ্রামের যত নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগই থাকুক না কেন, বুর্জোয়া চিন্তাপদ্ধতিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক কর্মসূচির দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কী করে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে? এসব সত্ত্বেও যদি শুধুমাত্র কতগুলো লড়াই এবং আত্মত্যাগের উদাহরণ খাড়া করে ও পার্টিটির নামের জোরে দাবি করা হয় যে, এটি একটি কমিউনিস্ট পার্টি, তাহলে কি একথাই বুঝতে হবে যে, একটি পার্টি বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয়েও কমিউনিস্ট পার্টি নাম নিয়ে চলেছে এবং বহু সংগ্রাম পরিচালনা করেছে বলে তা কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে যেতে পারে? অবস্থা বিশেষে পেটিবুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলো বা বুর্জোয়া পার্টিগুলোও যে জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে অনেক লড়াই পরিচালনা করে এবং প্রয়োজনমত এমনকী অনেক মারমুখী লড়াইও তারা সংগঠিত করে, একথা বোঝবার জন্য তো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। তাহলে, তাকে কেন্দ্র করে সংগ্রামের সফলতা-বিফলতা ভুল-ত্রুটি যাই হোক্ না কেন, তার আলোচনার দ্বারা এবং এ ধরনের একটি পার্টির ভুল স্বীকারের দ্বারা একটি বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া পার্টিকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাই বুঝিয়ে থাকে। এরূপ একটি পার্টিকে সংশোধনের দ্বারা একটি সঠিক শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল হিসাবে গড়ে তোলার প্রশ্ন ওঠে কী করে? অথচ, সেদিন পার্টির কোন কর্মী বা নেতা পর্যন্ত সাহসের সাথে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন তো নয় যে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এইসব নেতারা বা নকশালপন্থী বলে পরিচিত বিপ্লবীরা সেদিন পার্টির মধ্যে ছিলেন না। সেই পার্টির মধ্যেই তাঁরা সেদিন সকলে ছিলেন। কিন্তু, সেদিন তাঁরা কেউই এ প্রশ্ন করেননি। তাঁদের ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম, যেন ভুল স্বীকার করলেই হল। ভুলটি কী চরিত্রের — সেটি কি মৌলিক প্রকৃতির, না অন্য কিছু — সেটা জানার দরকার নেই। এই ভুল স্বীকারের দ্বারা পার্টিটির বিপ্লবী চরিত্র প্রকাশিত হল, নাকি পেটিবুর্জোয়া চরিত্রই আরও বেশি প্রকাশিত হ'ল — এত কথাও তাঁদের বোঝবার দরকার নেই। তাঁরা শুধু ভুল স্বীকারের দ্বারা সংশোধনের কথা বলেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করলেন।

তাঁরা মার্কসবাদের শ্রেণীতত্ত্বের এই গোড়ার কথাটাই জানেন না যে, সংশোধনের দ্বারা যেমন একটি শ্রেণীর রাষ্ট্রকে অপর একটি শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় না, তেমনি সংশোধনের পথে একটি শ্রেণীর দলকেও অপর একটি শ্রেণীর দলে রূপান্তরিত করা যায় না। এটা একটা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা। কার্ল মার্কস-এর মতো ক্ষমতাবান চিন্তানায়কও নিজের হাতে যে প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে তুলেছিলেন, সেটি যখন একটি পেটিবুর্জোয়া সংগঠনে পরিণত হল, তাকে তিনি সংশোধন করে সাচ্চা শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনে পরিণত করার অবৈজ্ঞানিক পথ গ্রহণ করেননি, নিজের হাতেই তাকে ভেঙে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেরও ঐ একই ইতিহাস। যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে লেনিন নিজের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছিলেন, সেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যখন আবার উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সংগঠনে পরিণত হল, তখন সেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে ভেঙে দেওয়ার জন্য জিমারওয়াল্ড সম্মেলনে লেনিন নিজেই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। জার্মানির রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং কার্ল লিবনেক্ট্ — 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সংগঠনে পরিণত হয়েছে' — লেনিনের এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়েও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়া সম্পর্কে লেনিনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁরা বরং বহুদিনের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে সংশোধনের পথে পুনরায় শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনে রূপ দেবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফলে, লেনিন একাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে আসেন এবং রাশিয়ায় সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে সংশোধন করা সম্পর্কে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কার্ল লিবনেক্ট দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে আসেন এবং জার্মানিতে নতুন করে 'স্পার্টাকাস' দল গঠন করেন। ফলে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যেটি আসলে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি ছাড়া কিছু নয়, তাকে সংশোধন করে একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলে পরিণত করার অবৈজ্ঞানিক পথ আমরা নিইনি।

মূল রাজনৈতিক তত্ত্ব বা স্ট্র্যাটেজি গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ভুলের ইতিহাস

এখন, আমাদের দেশের পূর্বের অবিভক্ত এবং বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিটির রাজনৈতিক তত্ত্ব যা নিয়ে তাঁরা বর্তমানে চলছেন এবং আলাদা হবার পর প্রত্যেকেই নিজের নিজের মূল রাজনৈতিক তত্ত্বকে সঠিক বলে দাবি করছেন, তার চরিত্রটি বিচার করে দেখা যাক। যে রাজনৈতিক লাইনটি একটি বিশেষ সময়কালে পার্টিকে 'গাইড' করে, যাকে আমরা 'স্ট্র্যাটেজি' বা মূল রণনীতি বলি, গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত এই পার্টিটি সেই মূল রণনীতি বা রাজনৈতিক তত্ত্ব যতবার গ্রহণ করেছে, ততবারই যে তারা ভুল করেছে, তা ইতিপূর্বে আমাদের বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। তবুও এই আলোচনায় আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য, আমি বিস্তৃত আলোচনা বা ব্যাখ্যার মধ্যে যাব না, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস — নিরবচ্ছিন্ন ভুলের ইতিহাস

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের যে সময়ে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী এই পার্টিটির জন্ম হয়, আপনাদের মধ্যে এখানে অনেকেই হয়ত জানেন যে, সেই সময়ে কংগ্রেস আজকের মত সরাসরি এবং পুরোপুরি বুর্জোয়াশ্রেণীর পার্টিতে রূপান্তরিত হয়নি। কমিনটার্নের দলিলেও একথার স্বীকৃতি আছে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই তখন কংগ্রেসের মধ্যে ছিল। অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের সেইসময়ে কংগ্রসের চরিত্র ছিল অনেকটা প্ল্যাটফর্মের মত। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করে তার ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা কংগ্রেসকে একটি খাঁটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণফ্রন্ট (anti-imperialist people's front) হিসাবে রূপ দেবার সম্ভাবনা তখন পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল এবং একটি বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দলের পক্ষে সে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যকরণীয় কাজ। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী এই পার্টিটি তথাকথিত রণদিভে গ্রুপের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে চূড়ান্ত সংকীর্ণতাবাদী নীতি অনুসরণ করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনটাকেই

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের আন্দোলন বলে আখ্যা দিলেন এবং তার থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন' গঠন করলেন এবং এইভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, যারা কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের নেতৃত্বকে পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করলেন। শুধু তাই নয়, এই ধরনের আচরণের দ্বারা কমিউনিজমকে দেশাত্মবোধের 'কারেন্ট' থেকে সেদিন তাঁরা যে আলাদা করে দিলেন তাই নয়, এর ফলে দেশাত্মবোধের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত অধিকাংশ মানুষ তখন থেকেই কমিউনিজমকে খানিকটা সংশয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করল।

তারপর ১৯৩৪ সালে এসে তাঁরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে তাকে সংশোধনের নামে একেবারে ঠিক উল্টো নীতি গ্রহণ করলেন। ১৯৩০ সালে যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে তাঁরা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল মনে করে কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন, ১৯৩৪ সালে সেই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণী তাঁদের মতে শুধু প্রগতিশীলই হল না, এতটা প্রগতিশীল এবং বিপ্লবী হয়ে গেল যে, শ্রমিকশ্রেণীর তার সাথে 'জাতীয় ফ্রন্ট' গঠনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করলেন এবং এইভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর যুগ্ম নেতৃত্বে 'জাতীয় ফ্রন্ট' গঠনের স্লোগান দিয়ে লেনিন কর্তৃক বহু পূর্বেই পরিত্যক্ত প্লেখানভের 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট'-এর তত্ত্বকেই তাঁরা মুখে না হলেও কার্যত আমদানি করলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অনুযায়ী আমরা জানি, শ্রেণীসংগ্রাম যত বিকাশ লাভ করতে থাকে বুর্জোয়াশ্রেণীও তত প্রতিক্রিয়াশীল হতে থাকে, অর্থাৎ যত দিন যায় বুর্জোয়ারা শ্রেণীগতভাবে তত প্রতিক্রিয়াশীল হয়। অথচ, এই পার্টিটির ব্যাখ্যা অনুযায়ী '৩০ সালের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা '৩৪ সালে এসে কিন্তু প্রগতিশীল হয়ে গেল! এবং এইভাবেই তাঁরা ভুল শুধরে সঠিক হলেন!

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবির পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির নির্লজ্জ সমর্থন

যাই হোক্, আপনারা দেখতে পেলেন, এই পার্টির নেতারা ১৯৩০ সালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণীকে যেমন নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করলেন, পরে আবার ১৯৩৪ সালে তাদের 'জাতীয় ফ্রন্ট'-এর তত্ত্বের দ্বারা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে শুধু প্রগতিশীল নয়, এমনকী বিপ্লবী হিসাবে জনগণের কাছে তুলে ধরে জনতার চোখে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বকেই আরও পাকাপোক্ত করতে অধিকতর সাহায্য করলেন। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে ১৯৩৯ সালে এসে — 'মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতেই একটা জাতি' — এই যুক্তির ভিত্তিতে তাঁরা মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবিকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বলে সমর্থন জানালেন এবং এইভাবে 'রাইট অফ নেশানস্ টু সেলফ্ ডিটারমিনেশন' (জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার) — মার্কসবাদের প্রখ্যাত এবং বহু প্রচারিত এই তত্ত্বকে তাঁরা বিকৃত করলেন। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা পরবর্তী সময়ে 'কংগ্রেস-লীগ' ঐক্যের আওয়াজ তুললেন। তাঁরা বলতে শুরু করলেন, কংগ্রেস এবং লীগ — অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতৃত্ব যার চরিত্র ক্যাপিটো-ফিউডালিস্ট লিডারশিপ[২], আর, মুসলিম লীগের নেতৃত্ব যার চরিত্র ফিউডো-ক্যাপিটালিস্ট লিডারশিপ[৩] যার মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব কংগ্রেসের চাইতে বেশি প্রকট — এই দুটো নেতৃত্বের ঐক্য না হলে নাকি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কখনই লাভ হতে পারে না। তাঁদের অতীতের খবর যদি আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে জানতে পারবেন, সেদিন এই কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী পার্টিটি একদিকে কংগ্রেসের ঝান্ডা, আর একদিকে লীগের ঝান্ডা আর মাঝখানে লাল ঝান্ডা একত্রে বেঁধে অজস্র মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে 'কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই' — এই স্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপিয়েছেন। '৩০ সালের ভুল সংশোধনের কী বিচিত্র রাস্তা তাঁরা সেদিন গ্রহণ করেছিলেন, আপনারা নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছেন।

'৪২ সালের আন্দোলনের বিরোধিতা কমিউনিজমকে দেশাত্মবোধের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই সাহায্য করেছে

তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁদের তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ যাই থাকুক না কেন, '৪২ সালে যখন সমস্ত দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে, সেই গোটা

আন্দোলনটাকেই জাপানি সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের দালাল আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়ে তাঁরা যে তার ঘোরতর বিরোধিতা করলেন তাই নয়, সেই জাতীয় অভ্যুত্থানের মুখে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ লড়ছিল, 'যোশী-ম্যাক্সওয়েল' চুক্তির দ্বারা, তা লিখিত কি অলিখিত চুক্তি ছিল তা তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাই বলতে পারেন, তাঁরা ফ্যাসিবাদকে রোখার নামে কার্যত সেই সাম্রাজ্যবাদেরই দালালি করেছেন। এই কান্ডটির ফলে সমগ্র দেশাত্মবোধক আন্দোলনের 'কারেন্ট' থেকে তাঁরা যে শুধু বিচ্ছিন্ন হলেন তাই নয়, দেশের দেশাত্মবোধক মনোভাবের সামনে কমিউনিজমের আদর্শকে তাঁরা মারাত্মকভাবে হেয় করে ফেললেন। পরবর্তীকালে এর যে কী বিষময় পরিণাম ঘটেছিল, তা তদানীন্তন কালের কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা সকলেই জানেন, আজকালকার কর্মীরা হয়ত তা ঠিকমত বুঝতে পারবেন না।

পণ্ডিত নেহেরুকে সমর্থন করার উদাত্ত আহ্বান

তারপর ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপসরফার মারফত কংগ্রেসের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যখন ক্ষমতা হস্তগত করে এবং নেহেরুর নেতৃত্বে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও আবার আর একদফা পুরনো ভুল স্বীকার করে, যদিও কী ভুল তাঁরা করেছিলেন পরিষ্কারভাবে সেই আলোচনার মধ্যে গেলেন না, তাঁরা 'মাউন্টব্যাটেন অ্যাওয়ার্ড'কে 'একধাপ অগ্রগতি' বলে অভিহিত করলেন এবং আওয়াজ তুললেন — 'নেহেরুকে সমর্থন কর, জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন কর' (All support to Nehru, build up People's Democratic Republic)। সেইসময়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জহরলাল ও প্যাটেলের মধ্যে যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে জহরলালকে প্রগতিশীল ও প্যাটেলকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে চিহ্নিত করে — যেমন তাঁরা বর্তমানে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ইন্ডিকেট ও সিন্ডিকেটপন্থীদের ক্ষেত্রে বিভেদ টানছেন — তাঁরা বললেন, দরকার হয় প্যাটেল পদত্যাগ করবে, নেহেরু তুমি নয় — কমিউনিস্ট পার্টি তোমার পিছনে রয়েছে (You Nehru don't resign, we communists are behind you)। এইভাবে পণ্ডিতজির নেতৃত্বে প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' গঠনের মারফত ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'নয়া গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার অভিনব তত্ত্ব তাঁরা আবিষ্কার করলেন।

রণদিভে নেতৃত্বের ভুল স্বীকৃতির ব্যর্থ প্রয়াস

১৯৪৮ সালে এসে দীর্ঘদিনের উপরোক্ত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী রাজনীতির বেড়াজাল থেকে পার্টিকে রক্ষা করার মহান উদ্দেশ্যে রণদিভের তথাকথিত 'বিপ্লবী গোষ্ঠী' পুনরায় পার্টির নেতৃত্বে এলেন। তিনি এসে পার্টি অতীতে যেসব ভুল করেছিল, সেইসব ভুল স্বীকৃতির একটি লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করলেন। তার মধ্যে খুবই মূল্যবান (!) ও অভিনব যে দু'টি ভুলের স্বীকৃতি তিনি দিলেন, তার একটি হচ্ছে, তিনি বললেন, পার্টির মধ্যে এতদিন নাকি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণই ছিল না। অথচ, গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ ব্যতিরেকে পার্টিটি ২০ বৎসর ধরে কমিউনিস্ট পার্টিই কী করে রইল, সে প্রশ্নটির জবাব তিনিও দিলেন না বা পার্টি কংগ্রেসে ডেলিগেটদের মধ্যেও কেউ তাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন না। তা সে যাই হোক্, রণদিভের মতে যেহেতু পার্টিতে নিম্নতম পার্টিবডির একজন সদস্যের সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটিতে আবেদন করার ধারাটি পার্টি সংবিধানে ছিল না, সেইহেতু পার্টির মধ্যে নাকি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ ছিল না। পার্টি সংবিধানের মধ্যে শুধুমাত্র সেই ধারাটি জুড়ে দিয়ে তিনি পার্টিকে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে একমুহূর্তে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, 'পার্টির এই প্রথম বলশেভিকীকরণ করা হল' (for the first time Bolshevised)। আর রণদিভের সেই 'বলশেভাইজড্' পার্টি তিন বছরের মধ্যেই দেখা গেল 'মেনশেভাইজড্' হয়ে গিয়েছে এবং অজয় ঘোষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর পার্টির বক্তব্য অনুযায়ী জানা গেল যে, রণদিভে নেতৃত্বে আসার আগে পর্যন্ত পার্টির মধ্যে যতটুকু গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ ছিল, রণদিভে নাকি তাও শেষ করে দিয়ে পার্টিকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অভিনব যে ভুলটি তিনি স্বীকার করেছিলেন, তা হচ্ছে, '৪২ সালের পার্টির 'জনযুদ্ধে'র তত্ত্ব ঠিকই ছিল এবং যুদ্ধোপকরণ বাড়াবার স্বার্থে 'উৎপাদন অব্যাহত রাখার' পার্টি নীতিটিও ঠিক ছিল, তবে ভুল নাকি যেটা হয়েছিল, তা হচ্ছে, মালিকশ্রেণীর সাথে শ্রমিকশ্রেণীর যে মূলগত বিরোধ বর্তমান — অর্থাৎ মালিকশ্রেণীর সাথে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটিই পার্টি ভুলে গিয়েছিল! অথচ, এই অপরূপ ভুল স্বীকৃতির দলিলটিও পার্টি সম্মেলনে সিপিআই এবং বর্তমান সিপিআই (এম)-এর

ঝানু ঝানু নেতাদের উপস্থিতিতেই গ্রহণ করা হয়েছিল। আশ্চর্যের কথা তারপরেও এই পার্টিটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নাম নিয়ে এদেশে চলছে এবং কর্মীরা বিনা দ্বিধায় তা মেনে চলছেন।

এত বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও রণদিভের তথাকথিত 'বিপ্লবী গোষ্ঠী'র নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে কলকাতা সম্মেলনে গৃহীত বিপ্লবের তত্ত্বটি, অর্থাৎ রণনীতিটি, কিন্তু মূলত যোশীর মতোই রয়ে গেল, শুধুমাত্র কিছু শব্দগত পার্থক্য রচনা করা এবং সংগ্রাম কৌশলের পরিবর্তন করা ছাড়া। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ীও ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র 'আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক'ই রইল এবং বিপ্লবের মূল লক্ষ্য 'সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লব'ই থেকে গেল। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে তিনিও প্রগতিশীল এবং বিপ্লবের মিত্রশ্রেণী হিসাবেই চিহ্নিত করলেন, অর্থাৎ এককথায় বিপ্লবের তত্ত্বটি যোশীর নেতৃত্বের অনুরূপ 'নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্বই রয়ে গেল, শুধু তার নাম পাল্টে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' বলা হল। এবং এইভাবেই ভুল শুধরে রণদিভে নেতৃত্ব যোশীর দক্ষিণপন্থী রাজনীতির হাত থেকে পার্টিকে মুক্ত করলেন! তবে তিনি বাড়তি যেটা করলেন, সেটা হচ্ছে, তিনি আবার তাঁর সেই পুরনো উগ্র বামপন্থার রাস্তায় — 'জনগণ নতুন সংগ্রামী শক্তি হিসাবে জেগে উঠেছে' — ঠিক যেমন বিগত যুক্তফ্রন্টের আমলে রণদিভে এবং প্রমোদ দাশগুপ্তের মতে নতুন শক্তি জেগে উঠেছিল — হঠাৎ এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে বিপ্লবী আন্দোলন এবং শ্রমিক-চাষীর বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামগুলিকে গড়ে তোলা ও তার মারফত আপসকামী শক্তিগুলিকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে গণআন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শ্রমিক-চাষীর বিপ্লবী সংগঠনগুলো গড়ে তোলার আগেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করে দিলেন।

কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের নামে যখন তিনি সরাসরি লড়াই আরম্ভ করলেন. তখন পার্টি কংগ্রেসে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্ব গৃহীত থাকা সত্ত্বেও তিনি দেখলেন, বাস্তবে বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই তাঁকে লড়তে হচ্ছে। এই অবস্থার চাপে পড়ে পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত মূলনীতির কোনরূপ তোয়াক্কা না করে বা পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত তত্ত্বটির, অর্থাৎ 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্বটির কোনরূপ পরিবর্তন না করেই তিনি বললেন — বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুর্জোয়া সরকারকে উচ্ছেদ না করে আমরা সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করতে পারি না (We cannot fight imperialism without fighting the bourgeoisie and the bourgeois govt.)। এর ফলে পার্টির তত্ত্ব এবং কর্মের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্বন্ধই আর রইল না। পার্টির কার্যধারা হয়ে পড়ল তত্ত্বের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তিনি তাঁর এই উক্তির দ্বারা তত্ত্বগত দিক থেকেও এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হলেন। কারণ, বুর্জোয়া গভর্নমেন্টের সঙ্গে লড়াই হলে বিপ্লবী শ্রেণীসমাবেশের ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়াদের কোনরূপ ভূমিকা থাকতে পারে না, আর অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ প্রধান বৈশিষ্ট্য না হলে বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রাম বিপ্লবের মূল দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা দিতে পারে না। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে দলের কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের তাত্ত্বিক, বর্তমানের শোধনবাদী নেতা, তখনকার রণদিভের একেবারে বিশ্বস্ততম ব্যক্তি ভবানী সেন ভারতীয় কৃষিতে পুঁজির কীরকম দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটছে তার তথ্য পরিবেশন করতে আরম্ভ করলেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৫১ সালে অজয় ঘোষের নেতৃত্ব কায়েম হবার পর সেই তাত্ত্বিক ভবানী সেনই আবার ভারতীয় কৃষিতে সামন্ততন্ত্র কত অধিক পরিমাণে বর্তমান, তার সপক্ষে ঠিক উল্টো তথ্য জোগাড় করে পরিবেশন করতে আরম্ভ করলেন এবং আজও করে চলেছেন।

যাই হোক্, রণদিভের উগ্র বামপন্থার নীতি পার্টির ওপর যখন চূড়ান্ত আঘাত নিয়ে এল, তখন রণদিভে আবার পার্টি নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হলেন এবং অল্প কিছুদিনের জন্য রাজেশ্বর রাও পার্টি নেতৃত্বে এলেন। তিনি এসেও বিপ্লবের তত্ত্ব 'সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্বই রাখলেন। শুধু রণদিভের সাথে কৌশলগত লাইনের ক্ষেত্রে খানিকটা পার্থক্য দেখা গেল। তিনি চীনের অনুকরণে প্রায় হুবহু আজকের নকশালপন্থীদের লাইনের মতই কৃষক এলাকায় 'গেরিলা যুদ্ধের লাইন'টি গ্রহণ করলেন। আজ সেই রাজেশ্বর রাও-ই চূড়ান্ত সংশোধনবাদী বলে নকশালপন্থীদের দ্বারা বর্ণিত হচ্ছে! তারপর পূর্বের যোশীর দক্ষিণপন্থা এবং রণদিভে-রাজেশ্বর রাওয়ের উগ্র বামপন্থা — এই দুটো লাইনের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করে অজয় ঘোষ নেতৃত্বের অভ্যুত্থান হল এবং ঘোষণা করা হল, পূর্বের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং বামপন্থী সুবিধাবাদ — এই উভয় থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত হল! মনে রাখবেন, এই ঘোষণার সাথে সেদিন যাঁরা একমত হয়েছিলেন, বর্তমান সি পি আই(এম) নেতৃত্বের সকলেই এবং আজকের নকশালপন্থী নেতাদেরও সবাই তার মধ্যে ছিলেন।

যোশী-রণদিভে-রাজেশ্বর রাও ও অজয় ঘোষের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য থাকলেও তত্ত্বগত মৌলিক কোনও পার্থক্য ছিল না

অজয় ঘোষের নেতৃত্বে '৫১ সালে মাদুরাইতে মূল তত্ত্বগত যে দলিলটি গৃহীত হল, সে দলিলের মূল বক্তব্য — কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটিকে অর্থাৎ কৌশলগত দিকটিকে বাদ দিলে — তত্ত্বগত দিক থেকে যোশী-রণদিভে-রাজেশ্বর রাওয়ের মতই রয়ে গেল এবং আজকের নকশালপন্থীদের রাষ্ট্র, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে যেটা মূল ব্যাখ্যা, মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, তার সঙ্গে প্রায় হুবহু এক। তিনিও ভারতবর্ষের বিপ্লবকে 'সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিপ্লব' হিসাবে আখ্যা দিলেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রকে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে ব্যাখ্যা করলেন। আজকের নকশালপন্থীদের সাথে পার্থক্য শুধু এইটুকু ছিল যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসাবে ব্যাখ্যা করেও পার্লামেন্টারি নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করলেন।

অজয় ঘোষের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে আজকের নকশালপন্থীদের মতই 'নামেমাত্র স্বাধীনতা' এবং ভারতীয় রাষ্ট্রকে 'সাম্রাজ্যবাদের পুরোপুরি একটা তাঁবেদার রাষ্ট্র' হিসাবে ব্যাখ্যা করার ফলে কিছুদিন বাদেই পার্টির তত্ত্বের সাথে কর্মের আবার স্ববিরোধিতা দেখা দিল। ভারতবর্ষ তখন বিভিন্ন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আফ্রো-এশিয়ান নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ করার চেষ্টা করছে (যেমন কলম্বো, বান্দুং সম্মেলন), অন্যদিকে সোভিয়েট এবং চীনের সাথে তার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার ঝোঁক বাড়ছে, বান্দুং সম্মেলনে চীনের সাথে মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে, ভারত-চীন যুগ্ম উদ্যোগে পঞ্চ শীল নীতির উদ্ভাবন হয়েছে এবং চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন — দু'দেশই ভারতের শান্তি নীতি এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতির খুব তারিফ করছে। এরূপ অবস্থায় পড়ে তাঁদের মাদুরাই কংগ্রেসে গৃহীত মূল বিপ্লবী তত্ত্বটির, অর্থাৎ পার্টির রণনীতিটির কোনরূপ তোয়াক্কা না করেই অন্ধের মত — তাঁদের যে অন্ধ অনুকরণের অভ্যাসের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি — তাঁরা ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি ও শান্তি নীতির সমর্থক হয়ে পড়লেন। এর ফলে তাঁদের মূল রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে দলের 'প্র্যাকটিস্', অর্থাৎ কর্ম বা সংগ্রাম কৌশলের মধ্যে যে মৌলিক বিরোধ দেখা দিল, তা হচ্ছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাটা যদি শুধুমাত্র নামে স্বাধীনতা হয়, এবং ভারতবর্ষ যদি পুরোপুরি তাঁবেদার রাষ্ট্র হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশেই চলে, তাহলে তার আবার স্বাধীন বৈদেশিক নীতি এবং স্বাধীন শান্তি নীতি কী করে হয়?

ফলে, কেন্দ্রীয় কমিটির দিল্লি বৈঠকে এসে তাঁরা এই স্ববিরোধিতার একটা মীমাংসা করার চেষ্টা করলেন এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, জাতীয় বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমেই প্রভাব বাড়ছে, সাম্রাজ্যবাদের সাথে জাতীয় বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরোধ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে এবং ভারতীয় রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে, জহরলালের নেতৃত্ব সংহত হওয়ার মধ্য দিয়ে যার প্রতিফলন ঘটছে, সেইজন্যই ভারত সরকার এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ফলে, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সরকারে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রাধান্যের কথা তাঁরা স্বীকার করতে শুরু করলেন, অর্থাৎ স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের কথা, পরিষ্কারভাবে মুখে বা লিখিতভাবে না হলেও, বাস্তবে তাঁরা মেনে নিলেন। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সরকারের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রাধান্যের কথা তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও, তত্ত্বে যেহেতু স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অস্বীকৃতিই থেকে গেল, অর্থাৎ রাষ্ট্রের চরিত্র মাদুরাইতে গৃহীত সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রই রয়ে গেল, সেইহেতু দিল্লিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে খানিকটা জোড়াতালি দেওয়া সম্ভব হলেও স্ববিরোধিতার যে প্রশ্নটির কথা আমি উল্লেখ করেছি, তার কিন্তু কোনও মীমাংসা হল না।

দিল্লির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের পর পালঘাটে পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'ল। এখানেও তাঁরা তাঁদের মূল রাজনৈতিক তত্ত্বের সাথে বাস্তব কর্মের স্ববিরোধিতার প্রশ্নটির মীমাংসা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। কারণ, পালঘাটেও রাজনৈতিক প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু 'সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবই' রয়ে গেল, বিপ্লবের শ্রেণীসমাবেশের ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের মিত্রশক্তি হিসাবেই তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন। শুধুমাত্র ভারত রাষ্ট্রের স্বাধীন শান্তিনীতি ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতির সমর্থন করতে গিয়ে যেহেতু

তাঁরা স্বীকার করেছেন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব ভারতীয় রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই আগের মত আর খোলাখুলি ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার রাষ্ট্র বললেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ যে একটি স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র — একথাও তাঁরা স্বীকার করতে পারলেন না, কারণ, বিপ্লবটা আর তাহলে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' থাকে না। ফলে, এরূপ অবস্থার সামনে পড়ে ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রের এক অপূর্ব ব্যাখ্যা তাঁরা দাঁড় করালেন। তাঁরা বললেন, 'ইট ইজ এ বুর্জোয়া-ল্যান্ডলর্ড স্টেট হেডেড বাই বিগ্ বুর্জোয়াসি' অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের চরিত্র হচ্ছে 'বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র।'

পুঁজিবাদের বিকাশের পথে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীতে পরিণত হয়

তাহলে, এখানে যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় তা হচ্ছে, এই যে বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণী দ্বারা প্রভাবিত ভারতবর্ষের বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র, সেই বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণী কারা? তাঁরা বললেন, এই বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণী হচ্ছে সেই সমস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, যারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'কোলাবোরেট' করেছে, গাঁটছড়া বেঁধেছে। সেইজন্যই তাদের লড়াইটা হচ্ছে এই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে নয়। অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদের 'কোলাবরেটর' (সহযোগী) আখ্যা দিয়ে তার থেকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে তাঁরা আলাদা করলেন। এখন প্রশ্ন যেটা আসে, তা হচ্ছে, যদি একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়ে থাকে ভারতবর্ষে, যে একচেটিয়া পুঁজির কথা তাঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন, তাহলে সেই একচেটিয়া পুঁজি কোত্থেকে এল? সে কি আকাশ থেকে পড়েছে? লেনিন তাঁর 'ইমপিরিয়ালিজম দি হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম' বইতে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, সব দেশেই পুঁজিবাদ দু'টি অন্তর্নিহিত ঝোঁক নিয়ে আসে। প্রথমত, পুঁজিবাদের চরিত্র থাকে জাতীয়তাবাদী এবং সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সে সংগ্রাম করে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের বিকাশের পথে জাতীয় পুঁজিই একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দেয়, পুঁজিবাদ হয়ে পড়ে কসমোপলিটান এবং বিকাশের এই স্তরেই তা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে। সুতরাং লেনিনবাদ অনুযায়ী পুঁজিবাদের বিকাশের পথে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীতে পরিণত হয়। তাহলে, ভারতবর্ষে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়েছে — এ কথা স্বীকার করলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী মানতেই হবে যে, পশ্চিমের ধনী ও বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তুলনায় পুঁজিবাদী অর্থনীতির অর্থে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পিছিয়ে-পড়া দেশ হলেও ভারতবর্ষে শুধুমাত্র যে জাতীয় পুঁজির জন্ম হয়েছে তাই নয়, এই পুঁজি ইতিমধ্যেই বিকাশের পথে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে নিজেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। এরূপ অবস্থায় বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে রয়েছে — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী একথার মানে দাঁড়ায়, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই ভারত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে রয়েছে। তাহলে, আজকের বিশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র, একথা কী করে অস্বীকার করা যায় ?

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ভারতীয় রাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয়ত, তাঁরা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, যে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত, তারা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার বা দালাল পুঁজিপতিশ্রেণী, তারা জাতীয় বুর্জোয়া নয়। অথচ, তাঁরাই আবার বলছেন, ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সাথে বিরোধ এমন তীব্রতর হচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব এমনভাবে বাড়ছে যে তার ফলে ভারতবর্ষের খোদ প্রধানমন্ত্রী জহরলালের নেতৃত্বে ভারতীয় রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীন শান্তিনীতিও স্বাধীন বৈদেশিক নীতিপ্রতিফলিত হচ্ছে। এই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব এবং নেতৃত্বই যদি রাষ্ট্রের ওপর থেকে থাকে এবং রাষ্ট্রের চরিত্র যদি 'বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র' হয়, তাহলে তাঁরা যাকে বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী বলছেন, সেই বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী তো তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ীই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী — যারা ভারত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী 'ট্রাস্ট ও কার্টেল'-এর ছোট অংশীদার

তৃতীয়ত, এই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী, যাদের সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী বলে

তাঁরা ব্যাখ্যা করছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র খেয়াল থাকলে তাঁরা একথাটা বুঝতে পারতেন যে, ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজির চরিত্র যদি সাম্রাজ্যবাদের দালালের চরিত্র হয়, তাহলে সেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়ারা কখনও 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেল' — যেগুলো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা, তার সভ্য হতে পারে না। অথচ ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই সমস্ত পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেল-এর অংশীদার, হতে পারে ছোট অংশীদার, কিন্তু অংশীদার এবং প্রতিযোগী। তাহলে সমস্ত দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই যারা নিজেরাই বিকাশের পথে একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে, তারাই ভারতীয় রাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শোষিত মানুষের মুক্তির সামনে প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের মিত্রশক্তি হলে সে বিপ্লব বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার বিপ্লব বোঝায় না

এরূপ অবস্থায় লড়াইটা যদি একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে হয়, তাহলে সেই লড়াইটা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই লড়াই বোঝায়। ফলে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই যেখানে বিপ্লবের সামনে মূল শত্রু হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করেই বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে, সেই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই কী করে আবার বিপ্লবের মিত্রশক্তি হতে পারে — এ একমাত্র সেই দলের তাত্ত্বিকরাই বলতে পারেন। এ জিনিস কোন সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর বোধগম্য হতে পারে না। এখানে একটি প্রশ্নই শুধু থাকে। তা হচ্ছে, একচেটিয়া পুঁজির সাথে 'স্মল প্রোডাকশন' (ক্ষুদ্র পুঁজি)-এর যে দ্বন্দ্ব দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে, সেই দ্বন্দ্বের সুযোগে স্মল প্রোডাকশনকে বিপ্লবের কাজে কী করে ব্যবহার করা যেতে পারে যা সবদেশেই বিপ্লবীরা করে থাকে। তার কৌশলগত দিকটি নিয়ে পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নের সাথে, যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার বিরুদ্ধেই এদেশের বিপ্লব মূলত সংগঠিত করতে হবে, সেই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রেণীগতভাবে কোনমতেই বিপ্লবের মিত্রশক্তি হতে পারে না। এরপরেও তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যদি তাঁদের বিপ্লবের মিত্রশক্তি হয়, তাহলে তাঁদের বর্ণিত বিপ্লব কোন অবস্থাতেই যে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার বিপ্লব বোঝায় না এবং এই অবস্থায় তাঁদের বিপ্লবের কর্মসূচি যে আসলে জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পার্লামেন্টারি নির্বাচনী লড়াইয়ের কর্মসূচিই বুঝিয়ে থাকে এবং বিপ্লবের আদর্শটা নিছক একটা কথা ও অর্থহীন স্লোগানে দাঁড়িয়ে যায় — এই কথাটাও দলের কর্মী ও তাত্ত্বিকরা ধরতে পারলেন না।

তাহলে দেখা গেল, তাঁদের তত্ত্বের সঙ্গে কর্মের যে স্ববিরোধিতা, যেটা মাদুরাই-এর পর থেকে তাঁদের আচরণে প্রকট হয়ে দেখা দিল এবং '৪৮ সালে রণদিভের আমলেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই পরিচালনা করতে গিয়ে যে স্ববিরোধিতা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, পালঘাট কংগ্রেসেও তাঁরা তার কোন মীমাংসা করতে পারলেন না। বরং, পালঘাট কংগ্রেসের পর অমৃতসর কংগ্রেসে গিয়ে তাঁরা যখন আর একধাপ এগিয়ে ঘোষণা করলেন যে, বুর্জোয়ার সঙ্গে 'জাতীয় ফ্রন্ট' গঠনের মারফত শান্তিপূর্ণভাবে, এমনকী পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবে, তখন এই স্ববিরোধিতার প্রশ্নটি আরও বেশি করে প্রকট হয়ে দেখা দিল। কারণ, এই ঘোষণার দ্বারা ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের ভূমিকাকে খোলাখুলিভাবে তাঁরা স্বাধীন ও সচেতন ভূমিকা হিসাবেই স্বীকার করে নিলেন। অথচ একটি সার্বভৌম বুর্জোয়া রাষ্ট্র ছাড়া পার্লামেন্টের ঐরকম স্বাধীন ভূমিকা কী করে হতে পারে, তাও তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন না, বা ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রকে সার্বভৌম বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবেও স্বীকার করে নিলেন না। অমৃতসর কংগ্রেসেও ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যা সেই পুরনো 'বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র'ই রয়ে গেল এবং বিপ্লবের তত্ত্বও 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' রয়ে গেল।

সি পি আই থেকে বেরিয়ে এসে সি পি আই (এম) গঠনের সময় কোনও মৌলিক তত্ত্বগত প্রশ্ন জড়িত ছিল না

এই স্ববিরোধিতা নিয়ে চলতে চলতে এসে চীন-ভারত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে পার্টির অভ্যন্তরে সংকট দেখা দিল। পার্টির ভিতরে গ্রুপের ঝগড়া পূর্বের থেকেই ছিল। রণদিভের নেতৃত্বে তথাকথিত 'বিপ্লবী গোষ্ঠী'

যাঁরা অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর ডাঙ্গের নেতৃত্বের আমলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা যখন দেখলেন, চীন ভারত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে দলের সভ্যদের বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদের মনোভাবকে ভিত্তি করে বেশ খানিকটা অংশকে বের করে নিয়ে এসে নিজেদের নেতৃত্বে নতুন পার্টি গঠন করা সম্ভব, তখন তাঁরা 'ডাঙ্গে চক্র' এবং 'যোশী চক্রে'র বিরুদ্ধে শোধনবাদী জিগির তুলে বেরিয়ে এসে সি পি আই (এম) নাম দিয়ে নতুন পার্টি গঠন করলেন। এই সি পি আই (এম) গঠন হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁদের পার্টির ইতিহাস আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি, যার মধ্যে আপনারা দেখেছেন, সি পি আই (এম)-এর বর্তমান সমস্ত নেতারাই 'কমিটেড' ছিলেন (দায়ী ছিলেন)। সে যাই হোক্, ১৯৬৪ সালে মূল তত্ত্বগত ক্ষেত্রে বিরোধের যে কথা বলে সি পি আই থেকে সি পি আই (এম) নেতারা বেরিয়ে এলেন এবং নতুন দল গঠন করলেন, আসলে সেটা মূল তত্ত্বগত ক্ষেত্রে কোন বিরোধ, নাকি অতীতের মতই কতগুলো কৌশলগত বা শব্দগত বিরোধের পার্থক্য খাড়া করে তাঁরা সেটাকেই মূল তত্ত্বগত বিরোধ বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন, এখন সেটা বিচার করে দেখা যাক।

কলকাতায় সি পি আই (এম)-এর প্রথম কংগ্রেস, যেটাকে তাঁরা পুরনো পার্টির ধারাবাহিকতায় সপ্তম কংগ্রেস বলে ঘোষণা করলেন, সেখানেও ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা শোধনবাদীদের মতই বললেন, 'এটি বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র'। তাঁদের পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত বিপ্লবের তত্ত্বটিও ঠিক অনুরূপভাবে আগের মতই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্বই রইল। বিপ্লবের শ্রেণীসমাবেশের ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে এবং ধনীচাষী, অর্থাৎ গ্রামীণ জোতদারশ্রেণীকে, তাঁরাও বিপ্লবের মিত্রশক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করলেন, এমনকী কলকাতায় গৃহীত তাঁদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভারতীয় পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিপ্লবের সম্ভাবনার কথাও তাঁরা উল্লেখ করলেন। শুধু এই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কারা সেইটে নিয়ে একটা পার্থক্য দেখা দিল। অর্থাৎ কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আছে কি নেই, এই নিয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একটা বিরোধ হল। সি পি আই মনে করত, কংগ্রেসের মধ্যে জহরলালের নেতৃত্বে যারা সংগঠিত তারাই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করছে। সি পি আই (এম) নেতারা বললেন, গোটা কংগ্রেসই সাম্রাজ্যবাদের দালাল, কোলাবোরেটর, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সংগঠন, ওখানে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নেই। অথচ কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যদি না থেকে থাকে, তাহলে এই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কারা এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠনই বা কী, সে সম্পর্কে কিন্তু সি পি আই (এম) নেতারা কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। অন্যদিকে আবার পুরনো সি পি আই-এর মতই মুখে বা লিখিতভাবে স্বীকার না করলেও স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথাটা তাঁরাও কিন্তু বাস্তবে মেনে নিলেন। আর, যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) দু'জনেই 'বিপ্লবের' মিত্রশক্তি এবং প্রগতিশীল হিসাবে মনে করে, সেই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে 'জাতীয় ফ্রন্ট' হবে, নাকি বিভিন্ন ইস্যুর ভিত্তিতে তার সাথে 'যুক্তফ্রন্ট' হবে, এটাই ছিল তাঁদের পার্টি ভাগ হওয়ার সময়ে তাঁদের মধ্যে তথাকথিত 'বিরাট মৌলিক' পার্থক্য !

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় বুর্জোয়ার বিশ্লেষণে সি পি আই (এম) নেতারা পালঘাট কংগ্রেসের শোধনবাদীদের মতই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীকে 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী' আখ্যা দিয়ে তার থেকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে আলাদা করলেন। অথচ আমি এইমাত্র আপনাদের সামনে আলোচনা করে দেখিয়েছি, এই বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী, যাদের তাঁরা কোলাবরেটর এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী বলছেন, তারাই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পথে যারা নিজেরাই একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। কাজেই, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের মিত্রশক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করার ফলে তাঁদের বিপ্লবটাও আসলে সি পি আই-এর মত নামেই বিপ্লব হবে এবং কার্যত বিপ্লবের বড় বড় বুক্নি আউড়ে তাঁরাও পার্লামেন্টারি রাজনীতিরই চর্চা করে চলবেন যা তাঁদের আচরণের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে এবং যে কংগ্রেসকে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বলে ব্যাখ্যা করছেন, পরবর্তীকালে সেই কংগ্রেসের মধ্যেই প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণী আবিষ্কার করে সুযোগ এবং সুবিধামত কখনও তার সাথে হাত মেলাবেন, কখনও তার বিরোধিতা করে চলবেন।

পরবর্তীকালে সি পি আই (এম) নেতারা তাঁদের বর্ধমান প্লেনামে ভারতীয় রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব বাড়ছে বলে স্বীকার করেছেন। কংগ্রেস যখন ইন্ডিকেট ও সিন্ডিকেট — এই দুই

ভাগে বিভক্ত হল. তখন সিন্ডিকেট থেকে ইন্দিরা কংগ্রেসকে তুলনামূলকভাবে 'প্রগতিশীল' হিসাবে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন। ইন্দিরা কর্তৃক ব্যাংক জাতীয়করণকে 'প্রগতিশীল কাজ' ও 'একধাপ অগ্রগতি' বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন, এবং এমনকী ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে 'একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী জনস্বার্থবাহী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে' বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, দল থেকে বেরিয়ে যাবার পর নকশালপন্থীরা যখন '৫১ সালে মাদুরাইতে গৃহীত দলিলের মতই 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্ব এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রকে 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক' বলে — 'স্বাধীনতাটা নামেই স্বাধীনতা' বলতে শুরু করলেন, তখন তাঁদের বিরোধিতা করতে গিয়ে রণদিভে তাঁর একটা লেখার মধ্য দিয়ে এমন পর্যন্ত বললেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীই বর্তমানে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে একটি 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক' রাষ্ট্রের বদলে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে তিনি স্বীকার করে নিলেন। একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র বাস্তবে স্বাধীন সার্বভৌম বুর্জোয়া রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হতে পারে? অথচ এতসব কথা বলেও কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত বললেন, 'যাই হোক, আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্য থাকছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী।' একদিকে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত — একথা মেনে নেওয়া এবং অপরদিকে সেই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেই তাঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্রশক্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করার ফলে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় তা হচ্ছে, তাঁদের 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্ব যদি রাষ্ট্রশক্তি উচ্ছেদের বিপ্লব হয়, যে রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতায়, রণদিভে বলছেন, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী রয়েছে, তাহলে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং গ্রামীণ ধনীচাষী আবার সেই বিপ্লবের তত্ত্বে মিত্রশক্তি হিসাবে বর্ণিত হয় কী করে? একথার উত্তর একমাত্র রণদিভের নেতৃত্বে 'বিপ্লবী গোষ্ঠী'-র (!) মত তাত্ত্বিকদের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। তাহলে দেখা গেল, বিপ্লবের মূল তত্ত্বগত প্রশ্নে অর্থাৎ বিপ্লবের স্তর নির্ণয়, রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ এবং বিপ্লবের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে সি পি আই-এর সাথে সি পি আই (এম)-এর পার্টি ভাগ হওয়ার সময়েও কোন পার্থক্য ছিল না এবং আজও নেই।

পার্টি ভাগ হওয়ার সময়ে আর একটি যে পার্থক্যের কথা তাঁরা খুব জোরের সাথে প্রচার করেছিলেন, তা হচ্ছে. সি পি আই (এম) মনে করত, সোভিয়েট ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী হয়ে পড়েছে, চীনই সঠিক বিপ্লবী লাইন অনুসরণ করে চলেছে। ফলে পার্টি ভাগ হওয়ার সময়ে তাঁরা চীনপন্থী হলেন। কিন্তু সে অবস্থা আজ আর নেই। এখন সি পি আই (এম)-এর মতে চীন ১৪ই জুনের চিঠি পর্যন্ত ঠিক ছিল, তারপর চীনও বিচ্যুত হয়েছে। সি পি আই (এম)-এর মতে, চীন এখন গোঁড়ামি করছে, মাও পূজার নামে ব্যক্তিপূজা করছে, যার সাথে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন করে সংশোধনবাদীরা বলে, প্রায় তেমন করেই একটু উনিশ-বিশ ঘুরিয়ে তাঁরা বলছেন। শুধু শব্দচয়নের ক্ষেত্রে একটু সতর্কতা অবলম্বন করছেন, যাতে 'র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল' ধরতে না পারে যে প্রকাশটা সংশোধনবাদীদের মতো হচ্ছে । বর্তমানে তাঁদের অবস্থাটা হচ্ছে, তাঁরা এখন নিরপেক্ষ, অর্থাৎ চীন সোভিয়েট — কোন পক্ষেই নেই। কিন্তু আসলে শোধনবাদের বিরুদ্ধে যাই জিগির তাঁরা তুলুন এবং ডাঙ্গেবিরোধী যত চিৎকারই করুন, আসলে কিন্তু আমি আগেই বলেছি, তাঁরাও ভিতরে ভিতরে সোভিয়েটের সঙ্গে একটু সখ্যতা এবং হৃদ্যতা চালাবার চেষ্টা করছেন; যদিও খুব বেশি এগোতে পারছেন না, বাইরে থেকে সি পি আই-এর বিরোধিতা, আর ভেতর থেকে র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের বিরোধিতার জন্য। আর, শোধনবাদের বিরুদ্ধে মুখে লড়াইয়ের বড় বড় কথা বলে বাস্তবে এমন সব ইউরোপীয়ান পার্টির সঙ্গে তাঁরা যুক্ত হচ্ছেন, যেমন রুমানিয়া — যে পার্টি শোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সোভিয়েটের চাইতেও দক্ষিণ ঘেঁষা। সেই পার্টির সঙ্গে শুধু তাঁরা সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন তাই নয়, পরস্পর পরস্পরকে খুব তারিফ করেন। এরপরও তাঁদের চোখে ডাঙ্গেরা শোধনবাদী!

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, পার্টি ভাগ হওয়ার সময়ে মূল তত্ত্বগত ক্ষেত্রে বিরোধের বড় বড় যে সমস্ত কথা বলে সি পি আই (এম) নেতারা নতুন পার্টি গঠন করলেন, আসলে তত্ত্বগত ক্ষেত্রে তা কোন বিরোধ ছিল না। মূলত গ্রুপের ঝগড়ার জন্যই শুধুমাত্র কৌশলগত ক্ষেত্রে এবং শব্দগত কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করে তাঁরা নতুন করে একটি পার্টি গঠন করলেন। যদিও দৈনন্দিন রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিরোধকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ক্ষেত্রে কৌশলগত প্রশ্ন বাদ দিলে সি পি আই-এর সাথে সি পি আই (এম)-এর কৌশলগত লাইনের সেই পার্থক্যটুকুও আজ আর নেই বললেই চলে।

পুরনো পার্টির অমার্কসবাদী চিন্তাপদ্ধতি ও বিচারধারা নিয়ে চলার ফলে সি পি আই(এম) একটি নয়া-শোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে

তাছাড়া, একটি বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই যে তাঁদের চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যে সি পি আই-এর শোধনবাদী ও অমার্কসবাদী চিন্তাপদ্ধতির সাথে একটি ছেদ টানা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, দল গড়ার সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি তাঁরা একেবারেই ধরতে পারেননি। কারণ, তাঁরা এটা ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁরাই সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি। তাই বোধ হয়, যে শোধনবাদী ও অমার্কসবাদী পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই দীর্ঘ ৩৫/৩৬ বছর ধরে তাঁদের চিন্তাপদ্ধতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক জীবন এবং বিচারধারা গড়ে উঠল, সেই নেতারা ও কর্মীরা পুরনো পার্টির সেই শোধনবাদী ও অমার্কসবাদী চিন্তাপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই কী করে সাচ্চা কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করলেন ও বজায় রাখলেন, সে সম্পর্কেও বিজ্ঞানসম্মত ও মার্কসবাদসম্মত কোন জবাব দেবার প্রয়োজনই তাঁরা মনে করলেন না। যে নতুন পার্টিটি তাঁরা গড়ে তুললেন, চিন্তাপদ্ধতিতে পুরনো পার্টির অমার্কসবাদী চিন্তাপ্রক্রিয়ার সাথে ছেদ ঘটানোর জন্য এবং একটি সঠিক বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দল গঠনের জন্য যে তিনটি কাজ সর্বপ্রথমে করা দরকার, যা আপনাদের কাছে আমি আগেই উল্লেখ করেছি, সেই প্রাথমিক অথচ কষ্টকর সংগ্রামটি পরিচালনা না করেই শোধনবাদী পার্টির চিন্তাপ্রক্রিয়ার আওতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পুরনো পার্টির নেতা ও কর্মীদের নিয়েই সাততাড়াতাড়ি একটি দল গঠনের ফলে এঁদেরও তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে পুরনো পার্টির মানসিকতা ও বিচারধারা কাজ করেছে এবং সেইজন্যই এঁদের বিপ্লবী তত্ত্বটিও মূলত পুরনো পার্টির তথাকথিত বিপ্লবী তত্ত্বটির অনুরূপই থেকে গিয়েছে, শুধুমাত্র কিছু কিছু বাক্‌চাতুর্য ও কৌশলগত লাইনের পার্থক্য ছাড়া। তাই এই পার্টি আর একটি নয়া-শোধনবাদী পার্টিতে পরিণত হয়েছে এবং যত চেষ্টাই করা হোক্ না কেন, সংশোধনের পথে পুরনো পার্টির মতই একেও আর কোনদিনই সঠিক বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর দলে পরিণত করা যাবে না।

সংগ্রামকৌশলগত ও শব্দগত পার্থক্য ছাড়া মাদুরাই থিসিসের সাথে নকশালপন্থীদের মূলগত পার্থক্য নেই

এখন, নকশালপন্থীদের সম্পর্কেও কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে বলা দরকার। সি পি আই(এম)-এর বর্তমান নেতারা শুধুমাত্র গ্রুপ-এর ঝগড়াকে ভিত্তি করে, পার্টির মধ্যে কর্মীদের বিপ্লবের প্রতি যে আকুলতা ছিল, তাকেই অহেতুক উত্তেজিত করে বেশ কিছু কর্মীকে বের করে নিয়ে আসার পর যখন নতুন পার্টি গঠন করে পার্লামেন্টারি রাজনীতির নিশ্চিত আশ্রয়ে গা ভাসিয়ে দিলেন, তখন কর্মীদের বিপ্লবের সেই অসহিষ্ণু আকুলতাই নকশালপন্থীদের জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু সি পি আই (এম) থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁরাও বিপ্লবের মূল তত্ত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে পুরনো শোধনবাদী পার্টিরই অনুরূপ 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্ব নিয়েই চলছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তাঁরা যা বলছেন, তা হচ্ছে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নাকি অর্জিত হয়নি ; স্বাধীনতাটা নামেই মাত্র স্বাধীনতা, আসলে ভারতবর্ষ একটি আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাঁদের মতে, এখানে সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কার্যত সাম্রাজ্যবাদের দালাল 'কম্প্রাডর বুর্জোয়াশ্রেণী' এবং সামন্তপ্রভুরাই সরকার পরিচালনা করছে। অর্থাৎ, তাঁদের বিপ্লবের তত্ত্বটিও সংগ্রামকৌশলগত প্রশ্ন ও শব্দগত কিছু কিছু পার্থক্য ছাড়া '৫১ সালে মাদুরাইতে গৃহীত বিপ্লবের তত্ত্বটিরই অনুরূপ একটি তত্ত্ব । তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঝানু শোধনবাদী অজয় ঘোষ নেতৃত্বের মাদুরাই দলিলটিকেই তাঁরা সঠিক বিপ্লবী লাইন বলে চীনের দোহাই দিয়ে পুনরায় চালাবার চেষ্টা করছেন। কেবলমাত্র সংগ্রামকৌশলের প্রশ্নে মাদুরাই দলিলের সঙ্গে যে পার্থক্যটা তাঁদের রয়েছে, তাও আপনারা বিচার করলে দেখতে পাবেন, তা মূলত রাজেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে অল্পকালের জন্য গৃহীত সংগ্রামকৌশলেরই প্রায় অনুরূপ। এই ঘটনা তাঁদের ক্ষেত্রে এই কারণেই ঘটছে যে, তাঁরাও পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তাপ্রক্রিয়ায় গড়ে ওটা অন্ধ অনুকরণের অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে হুবহু চীনের অনুকরণে ভারতবর্ষের বিপ্লবের লাইনটি গড়ে তুলছেন। এবং এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে, ঘটনা সম্বন্ধে, আন্দোলনগুলো সম্বন্ধে চীনা পার্টিকেও অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়ে তাঁদের ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সাহায্য করছেন।

কিন্তু প্রাক্-বিপ্লব চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বর্তমানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা কি এক? চীন

বিপ্লবের মহান নেতা মাও সে-তুঙ-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রাক্-বিপ্লব চীনের অর্থনীতি মূলত একটি আধা-ঔপনিবেশক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি ছিল। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ বিকাশের পথে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র গ্রহণ করা তো দূরের কথা, চীনে তখনও জাতীয় পুঁজির বিকাশই ভালোভাবে হয়নি। পুঁজিবাদ সেখানে তখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে, মানে জাতীয় পুঁজির সবেমাত্র জন্ম হচ্ছে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেই তাকে গড়ে উঠতে হচ্ছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবে চীনে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। এই জাতীয় বুর্জোয়া বলতে চীনে তখন কাদের বোঝাতো? চীনের বিপ্লবের স্তর সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে মাও সে-তুঙ বুর্জোয়া বলতে সেখানে শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণীকে বুঝিয়েছেন এবং 'থারটি ইয়ার্স অফ্ কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না' বইতেও এর উল্লেখ দেখতে পাবেন। কিন্তু, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা কি ঠিক এইরকম? বিদেশ থেকে ধার করা তত্ত্ব দেশের বাস্তব অবস্থার ওপর চাপানো এবং তার সপক্ষে মনগড়া যুক্তি, মাল-মশলা ও তথ্য জোগাড় করার ঝোঁকের দরুনই দেশের অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসটুকু পর্যন্ত তাঁরা ভালো করে লক্ষ করেননি।

ভারতীয় পুঁজিবাদ গড়ে ওঠার ইতিহাস

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার পরেও সিরাজদৌল্লার পতনের পূর্ব পর্যন্ত দেশের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার নিয়ে ভারতীয় বণিকী পুঁজির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমনকী খোদ গ্রেট ব্রিটেনের বাজারেও ভারতীয় বণিকরা ভালো ব্যবসা-বাণিজ্য করত। সিরাজদৌল্লার আমলে তাঁর সাথে এই বণিকী পুঁজিপতিদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এরই পরিণতিতে ভারতীয় বণিকী পুঁজিপতিদের এক অংশ, বিশেষ করে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগসুবিধা লাভের আশায় নবাবের শত্রুদের সাথে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে, ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। ফলে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পতন ঘটল এবং সম্পূর্ণরূপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তাঁবেদার মীরজাফরের নবাবি কায়েম হল। অথচ, যে আশায় বণিকী পুঁজিপতিরা সর্বরকম মদত দিয়ে মীরজাফরকে গদিতে বসাল, ফল হল ঠিক তার উল্টো। সিরাজদৌল্লার আমলে ইংরেজ বণিকদের চাইতে ভারতীয় বণিকদের যতটুকু বেশি সুযোগসুবিধা ও প্রাধান্য ছিল, মীরজাফরের আমলে তাও চলে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য এল। ইংরেজ বণিকদের ট্যাক্স মকুব করে দেওয়া হল, অথচ, ভারতীয় বণিকদের ওপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হল।

মীরকাসিমের নবাবির আমলে ভারতীয় বণিকী পুঁজিপতিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের চেয়ে পূর্বে যে অধিকতর সুযোগসুবিধা ভোগ করত তা ফিরিয়ে আনার জন্য, আর যদি তা নাও হয়, তাহলেও অন্তত ন্যূনপক্ষে ইংরেজ বণিকদের সাথে তাদের অবস্থা সমান করার জন্য প্রচেষ্টা চলতে থাকল। এরই ফলে মীরকাসিম ইংরেজ বণিকদের অনুরূপ ভারতীয় বণিকদেরও ট্যাক্স মকুব করে দিলেন যার ফলে মীরকাসিমের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আবার যুদ্ধ লাগল। এই যুদ্ধে মীরকাসিমকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে শুধু যে ইংরেজ রাজত্বের ভিত পাকাপোক্ত হল তাই নয়, এদেশের বণিকী পুঁজিও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুরোপুরি অধীনস্ত হয়ে পড়ল। ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে ঢাকার তাঁতশিল্পকে মেরে দেবার জন্য ঢাকার তাঁতিদের আঙুল কেটে দেওয়া হল এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য ভারতীয় কুটিরশিল্পগুলিরও ধ্বংস সাধন করা হল। এইভাবে ভারতীয় বণিকদের, যারা এতদিন দেশের কুটির শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং বিদেশের বাজারেও যাদের খুব আধিপত্য ছিল, তাদের সেই আধিপত্য ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেল। ফলে, ভারতীয় বণিকী পুঁজিপতিরা, যাদের স্বাভাবিকভাবেই শিল্পপুঁজি এবং জাতীয় পুঁজির জন্ম দেওয়ার কথা, তারা পুরোপুরি 'কম্প্রাডর বুর্জোয়া'য় পর্যবসিত হয়ে গেল — অর্থাৎ বিদেশের উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে ব্রিটিশ ফার্মগুলোর এজেন্ট হিসাবে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শুরু করল।

এই কম্প্রাডর বুর্জোয়াদের একটা অংশ দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে চলার মধ্য দিয়ে পুঁজি সঞ্চয় করতে করতে সিপাহি বিদ্রোহের পূর্বে বা সমসাময়িক কালে এসে জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে ধীরে ধীরে জাতীয় পুঁজির জন্ম দিতে শুরু করল। কার্ল মার্কসের সিপাহি বিদ্রোহের নোটেও এই তথ্যের সন্ধান মেলে। এই কম্প্রাডর বুর্জোয়ারা যখন শিল্পপুঁজির জন্ম দেওয়ার সূচনা করল, তাকে ভিত্তি করেই দেশের অভ্যন্তরে

ধীরে ধীরে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নবচেতনার সৃষ্টি হল। এইভাবে আমাদের দেশে কম্প্রাডর বুর্জোয়ার একটা অংশ যেমন ধীরে ধীরে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল বুর্জোয়া'তে রূপান্তরিত হল, আবার বাকি অংশের মধ্য দিয়ে 'কম্প্রাডর' ধারাটিও আমাদের দেশে পাশাপাশি চলতে থাকল। ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে, এমনকী '৩০ সাল পর্যন্তও আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা 'কম্প্রাডর বুর্জোয়া' এবং 'ন্যাশনাল বুর্জোয়া' এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। কমিনটার্ন-এর ৬ষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসে স্ট্যালিনের ঔপনিবেশিক থিসিস-এও তার স্বীকৃতি আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের মধ্যে এই জাতীয় বুর্জোয়াদেরই ঔপনিবেশিক থিসিস-এ 'স্বরাজিস্ট' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আজকের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শিরোমণি টাটা-বিড়লা গোষ্ঠী এই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ হিসাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষক ছিল।

ভারতীয় পুঁজিবাদ আজ নিঃসন্দেহে একচেটিয়া পুঁজিবাদের চরিত্র অর্জন করেছে

কংগ্রেসের এই জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আপসরফার ফলেই জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয় এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ভারত-বর্ষের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, ভারতবর্ষের জাতীয় পুঁজির বিকাশ বহুপূর্বেই শুরু হয়েছে এবং স্বাধীনতা অর্জনের বহু আগেই তা যথেষ্ট পরিমাণে সংহত হয়েছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বও এই তত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই ১৯২৫ সালে 'কমিউনিস্ট ইউনিভার্সিটি অফ্ দি টয়লার্স্ অফ দি ইস্ট'-এ প্রাচ্যের উপনিবেশগুলির মুক্তি আন্দোলনগুলো সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্ট্যালিন দেখিয়েছেন, সেই সময়ই ভারতবর্ষ প্রাচ্যের সমস্ত উপনিবেশগুলির মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের দিক থেকে সবচাইতে অগ্রসর এবং শক্তিশালী। ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন তাতে বোঝায় যে, তারা তখনই একটি অখন্ড শ্রেণীসত্তা (hemogeneous class) হিসাবে বিরাজ করছে। সেই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত শক্তিশালী হয়েছে এবং একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অথচ নকশালপন্থী নেতা ও কর্মীরা ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান এবং তার বিকাশের পথে যে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়েছে, তার অস্তিত্বের কথাই পুরোপুরি অস্বীকার করছেন। ভারতবর্ষে জাতীয় পুঁজির জন্ম, কল-কারখানার বিকাশ, ভারতীয় পুঁজির একচেটিয়া পুঁজিতে রূপান্তর, শিল্প পুঁজির সাথে ব্যাংক পুঁজির মিশ্রণের মারফত 'ফিনানসিয়াল অলিগার্কি'র জন্ম, 'স্টক এক্সচেঞ্জ' থেকে আরম্ভ করে ব্যাঙ্ক পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শিল্পজাত, এমনকী কৃষিজাত পণ্য এবং সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা, ভারতীয় লগ্নিপুঁজির জন্ম এবং এশিয়া, আফ্রিকা ছাড়াও বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমনকী খোদ আমেরিকা ও ব্রিটেন পর্যন্ত ভারতীয় লগ্নিপুঁজির কারবার, অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজির নিজেরই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন — তাঁদের মতে এগুলো সবই নাকি বিদেশি পুঁজি এবং সেই সমস্ত বিদেশি লগ্নিপুঁজি ভারতীয় পুঁজিপতিদের নামে ভারতীয় স্ট্যাম্প লাগিয়ে চলছে। তাঁদের মতে, আসলে এরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল, তাদের মাইনে করা চাকরের মত কাজ করছে। অর্থাৎ তাঁরা যা ব্যাখ্যা করছেন, তা হচ্ছে, আমেরিকা এবং ব্রিটেনের পুঁজি ভারতবর্ষের লেবেল লাগিয়ে ভারতের লগ্নিপুঁজির নামে এশিয়া-আফ্রিকাকে শোষণ করছে, আসলে এগুলো ভারতীয় পুঁজি না। সুতরাং অল্প হলেও যেখানে ভারতের লগ্নিপুঁজি বর্তমানে আমেরিকা এবং ব্রিটেনে খাটছে, সেখানে এঁদের এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে তার মানে দাঁড়ায়, আমেরিকা এবং ব্রিটেনের পুঁজি ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় লগ্নিপুঁজির লেবেল এঁটে এমনকী আমেরিকা ও ব্রিটেনে পর্যন্ত চলে যাচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে তাদের নিজেদের দেশের মানুষকেই আবার শোষণ করছে। গায়ের জোরে তাঁদের এই অভূতপূর্ব ব্যাখ্যা যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয়, তাহলেও যে প্রশ্নটা থেকেই যায়, যা আমি আপনাদের কাছে আগেই বলেছি যে, ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যদি সাম্রাজ্যবাদের দালালই হয় তাহলে তারা প্রতিযোগী অংশীদার হিসাবে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেল-এর সভ্য কী করে হতে পারে? 'কম্প্রাডর পুঁজিপতি'রা অর্থাৎ দালালরা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যান্ড কার্টেল-এর সভ্য — মার্কসবাদের 'পলিটিক্যাল ইকনমি'-র কোন নিয়ম বা সূত্র অনুযায়ীই হতে পারে না। অন্তত এই বিষয়ে লেনিনবাদের সিদ্ধান্তকে, যা মাও সে-তুঙ মেনে চলেন,

তা যদি মানতে হয়, তাহলে এই কথা স্বীকার করতেই হবে। অথচ নকশালপন্থীরা ওপর থেকে চাপানো একটি ভুল তত্ত্বের সমর্থনে গায়ের জোরে অদ্ভুত সব যুক্তি খাড়া করে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের বিকাশের সমস্ত ইতিহাসটাকেই 'শঙ্করাচার্যের মায়া' বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

প্রাক্-বিপ্লব চীনের অর্থনীতির সাথে ভারতীয় অর্থনীতির কোনরূপ সামঞ্জস্য নেই

এছাড়া চীনের প্রাক্-বিপ্লব অর্থনীতির চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাও সে-তুঙ বলেছেন, একটি জাতীয় অর্থনীতি অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত জাতীয় অর্থনীতির (অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতির) পরিবর্তে প্রাক্-বিপ্লব চীনের অর্থনীতি ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতি। ফলে, চীনে যেখানে কৃষিজাত উৎপাদিত দ্রব্য মূলত স্থানীয় গ্রামীণ বাজারের পণ্য ছিল সেখানে ভারতবর্ষে গ্রামীণ অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত জাতীয় অর্থনীতির অধীনে সম্পূর্ণ চলে গিয়েছে এবং কৃষিজাত উৎপাদিত দ্রব্য পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং একচেটে পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক ও স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে এই কৃষিজাত পণ্যের বাজারকেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছে। একথা বোঝার জন্য অর্থনীতির বিশেষ জ্ঞানের দরকার নেই। প্রতিদিন রেডিও খুললেই একথার সত্যতা ধরা পড়বে। ফলে অর্থনীতির চরিত্রেও প্রাক্-বিপ্লব চীনের সাথে ভারতবর্ষের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একথাও আপনাদের জানা দরকার যে, চীন-বিপ্লবের সময়ে চীনে গ্রামের সমস্ত চাষীদের সাথে ধনীচাষীদেরও বিপ্লবের মিত্রশক্তি হিসাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ চীনে ধনীচাষীর বিরুদ্ধে খেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব চাষীর দ্বন্দ্ব গ্রামে শ্রেণী সংঘর্ষের মূল দ্বন্দ্ব ছিল না। অথচ, এখানে সিলিং-এর ঊর্ধ্বে যারা জমি বেনাম করে রেখেছে, সেই সমস্ত বেনাম জমির মালিকদের বিরুদ্ধে তো বটেই, সিলিং-এর অন্তর্ভুক্ত ৬০ থেকে ৭৫ বিঘা পর্যন্ত যারা জমির মালিক, গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে যাদের ধনী চাষী এবং জোতদার বলা হয়, তাদের বিরুদ্ধেও খেতমজুর, ভাগচাষী এবং গরিব চাষীরা মরণপণ সংগ্রাম করছে। নকশালপন্থীদের থেকে শুরু করে সকলেই, যাঁরা গ্রামে খেতমজুর, ভাগচাষী ও গরিব চাষীদের স্বার্থে আন্দোলন সংগঠিত করেন, বাস্তবে এই ধনীচাষীদের বিরুদ্ধেই তাঁদের সকলকে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। আর না হলে, গরিব চাষীদের স্বার্থ রক্ষার বড় বড় কথা বলে আসলে গ্রামীণ এই জোতদারশ্রেণীর দালালিই করতে হয়। আজ গ্রামে গ্রামে জোতদারবিরোধী লড়াই বলে চাষীদের যে সংগ্রাম হচ্ছে, তা বাস্তবে তো এই সমস্ত ধনীচাষীদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ধনী চাষীরা চীনে যেখানে সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মিত্রশক্তি ছিল সেখানে আমাদের দেশে এই ধনীচাষীরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে শ্রেণীগতভাবে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মিত্রশক্তি — যারা জমিকে পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করেছে।

এখন প্রাক্-বিপ্লব চীনের সাথে ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রের চরিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যাক্। মাও সে-তুঙ-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রাক্-বিপ্লব চীনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল আধা-ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং তার চরিত্র ছিল প্রাক্-পুঁজিবাদী বিকেন্দ্রীভূত মধ্যযুগীয় চরিত্রের রাষ্ট্র। উপরন্তু, গোটা চীনে অখন্ড সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না। সমগ্র চীন দেশটা বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রভাবিত অঞ্চল হিসাবে আলাদা আলাদা টুকরোতে বিভক্ত ছিল এবং এই সমস্ত অঞ্চলগুলি আলাদা আলাদাভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার কতগুলো 'ওয়ার লর্ড'দের (সমরনায়কদের) দ্বারা শাসিত হত। কেবল নামেমাত্র একটি সংযোগরক্ষাকারী কেন্দ্রীয় সরকার নানকিং-এ ছিল। এই সমস্ত সমরনায়কদের আবার প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল এবং তারা প্রায়শই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করত। এমনকি নামেমাত্র নানকিং-এ যে কেন্দ্রীয় সরকারটি ছিল, তার বিরুদ্ধেও এই সমস্ত সমরনায়করা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করত এবং যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হত। এরূপ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই সার্বভৌম কোন পার্লামেন্ট এবং কেন্দ্রীভূত জাতীয় সৈন্যবাহিনী সেখানে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না এবং সেদেশে তাও ছিল না। ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে কি এর কোন মিল আছে? বরং ভারতবর্ষে যে কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ন্যায় একটি অত্যন্ত সুসংহত কেন্দ্রীভূত আধুনিক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমান এবং অত্যন্ত আধুনিক সুসংহত কেন্দ্রীভূত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতই এখানে একটি অত্যন্ত সুসংহত জাতীয় সৈন্যবাহিনী এবং একটি সার্বভৌম পার্লামেন্টের অস্তিত্ব বর্তমান আছে যার সাথে প্রাক্-বিপ্লব চীনের কোন মিল নেই। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, না রাষ্ট্রের চরিত্রে, না জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর গঠনে বা প্রকৃতিতে, না গ্রামীণ অর্থনীতির চরিত্রে এবং মূল শ্রেণীদ্বন্দ্বে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে, কোনদিক থেকেই আমাদের দেশের বিপ্লবের তত্ত্ব চীন বিপ্লবের তত্ত্বের সাথে এক হতে পারে না।

গেরিলা যুদ্ধের কৌশলের সাথে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন সম্পর্ক নেই

নকশালপন্থীরা আর একটি বিষয়েও গোলমাল করে ফেলছেন বলে আমার ধারণা। তা হচ্ছে, গেরিলা যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করার সাথে গ্রামে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে করে শহর ঘিরে ফেলার সংগ্রামকৌশলকে ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বকে তাঁরা এক করে ফেলেছেন। অথচ গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুসরণের জন্য চীনে 'নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্ব ও গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে করে শহর দখল করার সংগ্রামকৌশল গৃহীত হয়নি। মূলতঃ যে দুটি কারণের জন্য চীনে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে করে শহর দখল করার কৌশল গৃহীত হয়েছিল, তা হচ্ছেঃ ১) রাজনৈতিক-ভাবে — প্রথমতঃ, চীনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় বিকেন্দ্রীভূত চরিত্রের ;দ্বিতীয়তঃ, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বারা প্রভাবিত তাঁবেদার সমর নায়কদের অধীনে আলাদা আলাদাভাবে শাসিত বিভিন্ন অঞ্চল ও সেই সমস্ত সমরনায়কদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দেশের অভ্যন্তরে উন্নততর যাতায়াত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি;২) অর্থনৈতিকভাবে — একটি জাতীয় অর্থনীতির (unified national economy) বদলে চীনের অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে মূলতঃ এই দুটি কারণের জন্যই চীন বিপ্লবে গ্রামে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে করে শহর ঘিরে ফেলার সংগ্রামকৌশলকে বাস্তবে কার্যকরীভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। গেরিলা যুদ্ধের নীতি ও কৌশল গ্রহণ করার সাথে গ্রামে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করে করে শহর দখল করার সংগ্রামকৌশল ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব গ্রহণের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। আপনাদের মনে রাখা দরকার, স্বাধীনতার আন্দোলন হোক্, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হোক্, অথবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোক্— লড়াইটা যে দেশেই শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেবে, সেই দেশেই গেরিলা যুদ্ধের নীতি ও সংগ্রামকৌশল সেই দেশের বিপ্লবীদের গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য যেখানেই বিপ্লবীশ্রেণী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করবেন, তাঁরাই গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বে এবং কৌশলে কিছু না কিছু সংযোজন ঘটাতে বাধ্য হবেন। তা নাহলে তাঁরাও গেরিলা যুদ্ধ কে কেবলমাত্র অনুকরণ করে চালাতে পারবেন না। ফলে আপনারা বুঝতে পারছেন, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করার সাথে গ্রামাঞ্চলে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে করে শহর দখল করার সংগ্রামকৌশল এবং 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব' গ্রহণের, যা নকশালপন্থীরা এক করে ফেলেছেন, তার কোন সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়ে আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও মনে রাখা দরকার যেটা নকশালপন্থী নেতা বা কর্মীরা মোটেই খেয়াল করছেন না। তা হচ্ছে, চীনের পরিস্থিতিতে চীনের পার্টি গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সরাসরি অভ্যুত্থান, সশস্ত্র সংগ্রাম এবং গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করার আগে চাষীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কো-অপারেটিভ এবং চাষী সংগঠনগুলো গড়ে তুলেছিল। এইভাবে জনগণের ব্যাপক সমর্থন গড়ে তোলা ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ সেখানেও স্থায়ী হতে পারত না। এব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে, মাও সে-তুঙ-এর চিন্তার সাথে তাঁদের কার্যধারার কোন সম্বন্ধ নেই।

নকশালপন্থীরা বিপ্লবের নামে চে গুয়েভারার তত্ত্বকে ছাড়িয়ে প্রায় ডেব্‌রে তত্ত্বের জাবর কেটে চলেছেন

আসলে নকশালপন্থীরা বিপ্লবের নামে আজকাল যা করছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা চে গুয়েভারার তত্ত্বকেও একধাপ ছাড়িয়ে গিয়ে প্রায় ডেব্‌রে তত্ত্বেরই অনুরূপ একটি তত্ত্বকে অনুসরণ করে চলেছেন এবং তাকেই মাও সে-তুঙ-এর তত্ত্বের নামে তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হল, ক্ষমতা দখলের সত্যিকারের লড়াই সুরু করার আগে দেশের অভ্যন্তরে কষ্টসহিষ্ণু রাজনৈতিক এবং আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বিপ্লবী দলের শক্তিবৃদ্ধি এবং জনসাধারণের বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি গড়ে তোলার কোন দরকার নেই, শুধুমাত্র বিপ্লবীদের কতগুলো গ্রুপে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারলেই জনসাধারণ বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং বিপ্লবী সংগঠন আপনাআপনি জনসাধারণের মধ্যে গড়ে উঠবে। কাজেই যদি বিপ্লবীরা কতকগুলো খুব ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে ক্রমাগত বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিপন্ন করতে থাকে, তাহলে বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার শোষণে পর্যুদস্ত সমাজবিরোধীরাও তখন উৎসাহিত হয়ে ব্যক্তিসন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রকে বিব্রত করতে থাকবে। এই সুযোগে বিপ্লবীদের নামে 'এজেন্ট প্রোভোকেচার'-রাও এই কাজ করবে। এমনকী পুলিশের লোকেরাও, 'স্পাই'-রাও নিজেদের ব্যক্তিগত বিরোধকে ভিত্তি করে কখনও কখনও অপরকে ঘায়েল করার জন্য এই কাজ করবে। ফলে বিপ্লবের নামে চুরি-

ডাকাতি হবে, ব্যক্তিগত খুন-জখম হবে এবং তার দ্বারা রাষ্ট্রের মধ্যে একটা নিরাপত্তার অভাববোধ সৃষ্টি হবে এবং এইভাবে আপনাআপনি বিপ্লব হয়ে যাবে। এসব তত্ত্ব মাও সে-তুঙ-এর তত্ত্ব নয়। মাও সে-তুঙ-এর তত্ত্বের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বরং এরূপ তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-চিন্তার ঘোরতর বিরোধী। অথচ, ডেব্‌রে তত্ত্বের প্রায় অনুরূপ এই তত্ত্বকেই এঁরা মাও সে-তুঙ-এর তত্ত্ব বলে চালাচ্ছেন। একদিকে চীনের পার্টিকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে, আন্দোলনগুলো সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবশেন;অপরদিকে যা তাঁরা করছেন, যা মাও সে-তুঙ-এর শিক্ষাসম্মত নয়, তাকেই মাও-এর নীতি বলে চালাবার ফলে তাঁরা ভারতের রাজনৈতিকভাবে অসচেতন, অজ্ঞ জনসাধারণের চোখে এতবড় একজন মহান নেতা এবং চীনের পার্টির মর্যাদাকেই ক্ষুন্ন করছেন মাত্র।

কমিউনিস্ট নামধারী পূর্বের অবিভক্ত এবং বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত পার্টিটির কোনটিই ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি

তাহলে সমস্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা দেখতে পেলেন যে, বিদেশের তত্ত্বকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার তাঁদের চিরাচরিত অভ্যাসের ফলে — গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিশেষ করে '৪২ সালে তাঁদের আচরণ ও কার্যকলাপের কথা বাদ দিলে —১৯৪৮ সালে রণদিভে যখন তদানীন্তন সোভিয়েট তত্ত্ববিদ ঝ্‌দানভের কমিনফর্ম দলিলে বর্ণিত 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্বটি হুবহু কপি করে বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে ভারতবর্ষের ঘাড়ের ওপর জোর করে চাপালেন, তারপর থেকে তত্ত্বের সাথে কর্মের স্ববিরোধিতার সামনে পড়ে যতবারই বিভিন্ন পার্টি কংগ্রেসে তাঁরা আগের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছেন, আসলে সংগ্রামকৌশলগত কিছু কিছু পার্থক্য ছাড়া বিপ্লবের তত্ত্বটি কিন্তু তাঁদের প্রতিবারই মূলত এক থেকে গিয়েছে। এমনকী পার্টিটাও যে তত্ত্বগত ক্ষেত্রে বিরোধের কথা বলে পর পর দু'বার ভাগ হল, তাতেও কিন্তু আলোচনায় দেখা গেল, তত্ত্বগত ক্ষেত্রে মূলত কোন পরিবর্তন সাধন করতে তাঁরা সক্ষম হননি। তাছাড়া, দলটি গোড়া থেকেই চিন্তাপ্রক্রিয়ায় যে অমার্কসবাদী পদ্ধতি নিয়ে গড়ে উঠেছে, যার ফলে সি পি আই একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারেনি, সি পি আই (এম)-ও পুরনো পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে পার্টি গঠনের আগে পুরানো পার্টির অমার্কসবাদী চিন্তাপদ্ধতি থেকে ছেদ ঘটানো এবং একটি সঠিক মার্কসবাদী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হিসাবে যে প্রাথমিক সংগ্রামগুলি পরিচালনা করা দরকার ছিল, তা করেনি। অর্থাৎ (১) জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি দিককে ব্যাপ্ত করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে একটা 'কো-অর্ডিনেটেড সোস্যালিস্ট মুভমেন্ট' (সংযোজিত সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম) পরিচালনার মধ্য দিয়ে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলা ;(২) দলের নেতা, কর্মী, সমর্থক ও জনসাধারণের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের একটি বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলা, (৩) উপরোক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদল 'প্রোফেশনাল' বিপ্লবী গড়ে তোলা যাঁরা অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত সর্বক্ষণের কর্মীর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের হবে — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠনের পূর্বশর্ত হিসাবে এই তিনটি কাজ সম্পন্ন করার পূর্বেই তাঁরা সাততাড়াতাড়ি একটি দল গঠন করেছেন, যেটা আমি আগেই বলেছি। নকশালপন্থীরাও, যাঁরা শীঘ্রই আর একটি পার্টি গঠন করতে যাচ্ছেন বলে আমার ধারণা, তাঁরাও কিন্তু তাঁদের চিন্তাপদ্ধতিতে সি পি আই(এম)-এর চিন্তাপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ছেদ ঘটানোর জন্য এবং একটি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ার জন্য উপরোক্ত প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করার কোন কার্যকরী সংগ্রাম পরিচালনা করছেন না। ফলে, অদূর ভবিষ্যতে আর একটি নতুন পার্টি গড়ে তুললেও এঁদের সেই পার্টিও কালক্রমে সি পি আই, সি পি আই(এম)-এর মতোই অনুরূপ আর একটি শোধনবাদী পার্টিতে পর্যবসিত হবে। এই নতুন পার্টিটিও পুরনো পার্টির ট্র্যাডিশন, অর্থাৎ সেই একই চিন্তাপদ্ধতি ও গ্রুপ রাজনীতি নিয়েই গড়ে উঠবে বলে, এবং একই কারণে এঁদের তত্ত্বটিও কিছু কিছু শব্দগত ও সংগ্রামকৌশলগত পার্থক্য ছাড়া সেই একই 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র তত্ত্ব হওয়ার ফলে, এই নকশালপন্থীদের মধ্যেও আবার দু'টি পরস্পরবিরোধী ঝোঁক দেখা দিতে বাধ্য। একদল ধীরে ধীরে এসে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইবে, এবং আর একদলের মধ্যে বিপ্লবের আকুলতার দরুনই 'অ্যাডভেঞ্চারি'-এর ঝোঁক প্রকট হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে এটিও দু'ভাগে বিভক্ত হবে। সুতরাং আপনারা এই আলোচনা থেকে সহজেই বুঝতে পারছেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী আমাদের দেশের পূর্বের অবিভক্ত এবং বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত পার্টিটির কোনটিই ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের প্রশ্নেই হোক্ অথবা

আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেই হোক্ বা একটি শ্রমিকশ্রেণীর দল গঠনের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রেই হোক্, কোনওদিক থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আচরণ করেনি এবং এদের কোন অংশই ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামে অর্থাৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি উচ্ছেদের বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য নয়।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন, অভ্যাস, আচরণ পরিচালনা ও সংস্কৃতিগত মান উন্নত করার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি

এখন, দল বিচারের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক দিকটি ছাড়াও আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই। তা হচ্ছে, নতুন একটি শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলবার জন্য যে বিপ্লবটি আমরা করতে চাইছি, সেই বিপ্লবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোন কর্মসূচি এই পার্টিগুলির আছে কি নেই। অর্থাৎ, সমাজের মধ্যে যে পুরনো মানসিকতা আজও বর্তমান রয়েছে তাকে ভেঙে আমাদের দেশের বিপ্লবের পরিপূরক নতুন মানসিকতা, অর্থাৎ নতুন উন্নততর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান, যেটা সর্বহারা বিপ্লব গড়ে তোলার পরিপূরক, তা আনার জন্য জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে ব্যাপ্ত করে একটি সামগ্রিক ও যৌথজ্ঞানের ভিত্তিতে একটি পথনির্দেশক নীতি সেই দলগুলি দেশের জনসাধারণের সামনে, দেশের আন্দোলনগুলোর সামনে তুলে ধরেছে কিনা এবং বিশেষ করে দলের নেতা ও কর্মীরা যাঁরা এই আদর্শগত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা, তাঁরা এই সামগ্রিক ও যৌথজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রথমে নিজেদের জীবনে সেইগুলো প্রয়োগ করবার জন্য সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন কিনা — অর্থাৎ এককথায় রাজনৈতিক বিপ্লবের পরিপূরক আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করার যথার্থই কোনরূপ চেষ্টা করছেন কিনা। কারণ, একদল নেতা আছেন যাঁরা, কর্মীদের চেতনার মান যেহেতু খুব উঁচু স্তরে, খুব সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা অর্জনের স্তরে উঠতে সময় লাগে, সেহেতু তাঁদের চেতনার নিম্নমানের সুযোগে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ-এর দোহাই পেড়ে এবং মোটামুটিভাবে বিপ্লবের তত্ত্ব এবং গরম গরম বুলি আউড়ে এবং সময়ে সময়ে কিছু মারমুখী লড়াই পরিচালনা করে কর্মী ও জনসাধারণকে বোঝাতে চান, পার্টির রণনীতিটা এবং বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে বিশ্লেষণটা ঠিক হলেই নাকি পার্টিটা ঠিক হয়ে যাবে। তারপর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নেতাদের আচরণ যাই হোক্ না কেন; শিল্প, সাহিত্য, রুচি, নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকুক না কেন এবং প্রাত্যহিক আচরণের ক্ষেত্রে যত নিম্নতম সাংস্কৃতিক ও রুচিগত মানই তাঁরা প্রতিফলিত করুন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না ! তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, বিপ্লবের তত্ত্ব সম্পর্কে অর্থাৎ রাজনীতি সম্পর্কে ধারণাটা শুধুমাত্র মার্কসবাদসম্মত হলেই চলবে আর ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্ষেত্রে যদি নেতা ও কর্মীরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির দাসই থেকে যান, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন! সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনে আচরণের ক্ষেত্রে, রুচি ও অভ্যাসগত ক্ষেত্রে কর্মী ও নেতাদের জীবনে যদি বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব থেকে যায়, তাহলে শুধুমাত্র বিপ্লবী তত্ত্বের বুক্‌নির আড়ালে সর্বহারা বিপ্লব হয়ে যাবে? এ কখনও হতে পারে? না, এ কখনও সম্ভব? অথচ, একদল নেতা এই বিপ্লবী তত্ত্বটা ঠিক হলেই বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ ঠিক হলেই পার্টিটা ঠিক হয়ে গেল এবং তার দ্বারাই বিপ্লব হয়ে যাবে — এই কথা বলে কর্মী ও নেতাদের সর্বব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা সব বিপ্লবের আগে সেই বিশেষ বিপ্লবের পরিপূরক অর্থে প্রথমে করা প্রয়োজন, সেই গুরুদায়িত্বকে এড়িয়ে যান এবং নিজেরাও সেই অনুযায়ী মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাস, আচরণ ও সংস্কৃতিগত দিকটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন না। অথচ লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, cultural revolution precedes technical revolution, অর্থাৎ সংস্কৃতিগত বিপ্লব শুরু হবার পরই রাষ্ট্র দখলের বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। তাই যে কোন সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই জানেন যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মসূচির 'ইনটিগ্রেশন' (সংযোজন) ছাড়া কোন দেশের বিপ্লব সফল করা সম্ভব নয়।

এঁদের এরূপ আচরণ থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বিপ্লবের পরিপূরক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি অনুসরণ করার কোন প্রয়োজনই এঁরা বোধ করেন না। তাঁদের মতে এটা নাকি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপনাআপনি গড়ে উঠবে। আর, এরই ফলে এইসব তথাকথিত

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলির প্রভাব দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের ওপর যত বাড়ছে, দেশের ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের ওপর এদের প্রভাব যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাথে সাথে জনসাধারণের সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মান উন্নত হওয়া দূরের কথা বরং তা আরও দ্রুতগতিতে নিচের দিকে নামছে। এর কারণ কী এবং এটা হচ্ছে কেন — একবারও কি এইসব দলের নেতা কর্মী ও সমর্থকরা ভেবে দেখেছেন? ফলে আমি মনে করি, এই বিষয়টি খানিকটা আলোচনা হওয়া দরকার।

আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এদেশের জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও আন্দোলনের মধ্যে হাজার এক রকমের ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও যেহেতু এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সেদিনকার পরিস্থিতিতে মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক ছিল, তাই এত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তার প্রভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র, যুবসমাজ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট 'নোকর' বৃত্তির মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ও পুরনো সামন্তী সমাজের কূপমন্ডুকতা ও সর্বপ্রকার কুসংস্কার ভেঙে ফেলে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আদর্শ এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের ভিত্তিতে সেদিন জেগে উঠেছিল। সেদিন এ দেশের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় স্বাধীনতার জন্য যেমন স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তেমনি অনেক মারমুখী লড়াইও তারা পরিচালনা করেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐ সমস্ত লড়াইয়ের মধ্যে আমরা দেখেছি তারা একটা অপেক্ষাকৃত উন্নততর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানকে সবসময়েই প্রতিফলিত করেছে। তাই সেদিন দেশের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে কেউই উচ্ছৃঙ্খল বলেনি, বলেছে 'ফ্লাওয়ার্স অব বেঙ্গল'।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আজকের যুগের সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ

আমরা জানি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব, যা আজকের যুগে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ বা ভাবাদর্শ এবং যা বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের পঙ্গুতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে একটা নতুন শোষণহীন শ্রেণীহীন উন্নততর সমাজব্যবস্থার জন্ম দিতে সক্ষম। এবং একথাও আমরা জানি যে, বিপ্লবী ভাবাদর্শ ও মতবাদ এবং বিপ্লবী তত্ত্ব সবসময়েই উন্নততর সংস্কৃতিগত ও নৈতিক মানের জন্ম দিয়ে থাকে। এই উন্নততর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান অন্তত খানিকটা অর্জন করতে না পারলে একটা দেশের জনসাধারণ কখনই বিপ্লব সংগঠিত করতে পারে না। তাহলে, এই সমস্ত পার্টিগুলি, যারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের জাহির করছে, যদি যথার্থই তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতো, তাহলে এদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে অন্ততঃপক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের এবং ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের সর্বপ্রকার অপসংস্কৃতির প্রভাব খর্ব হওয়ার লক্ষণ দেখা দিত এবং তাদের মধ্যে একটা নতুন উন্নততর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের প্রতিফলন আমরা দেখতে পেতাম। অথচ বাস্তবে এর উল্টোটাই দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনাই কি প্রমাণ করে না যে, এরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে যে জিনিসের চর্চা এদেশে করছে, তা আসলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়। যেকোন যুগে যেকোন বিপ্লবী তত্ত্ব ও মতাদর্শের আসল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্তা নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত ও নৈতিক ধারণার মধ্যে। সেইরূপ বুর্জোয়া বিপ্লব ও পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের সর্বোচ্চ স্তরের মানবতাবাদী সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণার চেয়েও উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও নৈতিক মান অর্জন করার মধ্যেই যে নিহিত রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের মূল মর্মবস্তু ও প্রাণসত্তা, এটি ঠিকমত উপলব্ধি করতে না পারার ফলেই উপরোক্ত বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে। এঁদের হাতে পড়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হয়ে পড়েছে অনেকটা প্রাণহীন দেহের মত। প্রাণহীন দেহের মতই এইসব তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির সমাজজীবনে অবস্থান ও প্রভাববৃদ্ধি সমাজের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রমেই ক্ষতিসাধন করে চলেছে। ফলে এই সমস্ত তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলোর নেতৃত্বাধীনে যতদিন পর্যন্ত দেশের গণআন্দোলন এবং বামপন্থী আন্দোলন পরিচালিত হবে, ততদিন দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যত মারমুখী লড়াই-ই পরিচালনা করা হোক্ না কেন, শুধুমাত্র তার দ্বারা সাধারণভাবে জনতার মধ্যে এবং বিশেষ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক মানের ক্রমাবনতির এই ধারাকে কোনমতেই রোখা যাবে না। আর, দেশের জনসাধারণ যদি এইভাবে নিম্নতম সংস্কৃতির, অর্থাৎ সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ও সামন্তী সংস্কৃতির দাসই থেকে যায়, তাহলে যে কোনও সময়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিফলতা ও দেশজোড়া হতাশার মুখে তারা প্রতিক্রিয়ার শিকার বনে

যেতে পারে এবং শেষপর্যন্ত এমনকী প্রতিক্রিয়ার হাতে বিপ্লববিরোধী শক্তিতে পরিণত হতে পারে যেমন আমরা ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করেছি।

এছাড়া, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও — সমস্ত নেতারই বক্তব্য অনুধাবন করলে জানা যায় যে, উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করতে না পারলে সঠিকভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাই অর্জন করা যায় না। ফলে, এরা যখন বলে, 'বিপ্লবের তত্ত্বটা ঠিক হয়ে গেলেই পার্টিটা ঠিক হয়ে গেল', তখন এরা ভুলে যায় যে, সংস্কৃতিগত মান নিম্ন স্তরের হওয়ার ফলে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারও এদের ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে না। মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্ব অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ এবং দৈনন্দিন বিপ্লবী গণআন্দোলনগুলোর কলাকৌশল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এইসব তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি বারবার যে ভুল করে চলেছে. এটা তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ।

সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতা সঠিকভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়

দল বিচারের ক্ষেত্রে এই দিকটিকে আমাদের দেশে অনেকে লক্ষই করেন না;আর, যাঁরা করেনও, তাঁরাও এটাকে অনেকটা নগণ্যভাবে দেখেন। অথচ দল বিচার ও বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, যে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লব করবে সে যদি নিম্নতম সংস্কৃতির শিকার হয় তাহলে তার দ্বারা কোনদিনই বিপ্লব হতে পারে না। মার্কস একটা কথা বলেছেন, To change the world, workers will have to change themselves first – অর্থাৎ শ্রমিকরা একমাত্র তখনই দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে পারে যখন তারা নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়। এই কথার মানে হচ্ছে, শ্রমিকরা চায় বলেই বা কতগুলো বিপ্লবী বুলি আওড়ানো শিখলেই দুনিয়ার পরিবর্তন আনতে পারে না ; যে শ্রমিকরা দুনিয়াকে পরিবর্তন করবে, আগে তাদের নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত করতে হবে। কেন মার্কস একথা বলেছিলেন? মার্কসের এভাবে বলার প্রয়োজন কী ছিল? মার্কস তো বলতে পারতেন যে, শ্রমিকরা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি গত ক্ষমতার দ্বারা অথবা দৈনন্দিন সংগ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মারফত যদি একসময় কতগুলো বিপ্লবী স্লোগান ও তত্ত্বকথা আওড়াতে পারে, তাহলেই তারা বিপ্লবটাকে কার্যকরীভাবে রূপ দিতে পারবে। না, তা কখনও সম্ভব নয়। কারণ **উন্নততর সংস্কৃতিগত মান অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান আয়ত্ত করা ব্যতিরেকে বিপ্লবী তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতাকেই সঠিকভাবে অর্জন করা যায় না এবং বিপ্লবী তত্ত্বও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এই কারণেই বিপ্লবী রাজনীতিকে কার্যকরীভাবে রূপ দেওয়া মানেই হচ্ছে বাস্তবে জীবনটাকেই পরিবর্তিত করা লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই বিপ্লবের মধ্যে জড়িত করে। আর, এটার জন্য দরকার, প্রতিটি বিপ্লবের পূর্বে তার প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব।** অথচ, যাঁরা এই সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে বিপ্লব আনবেন, দলের সেই নেতা ও কর্মীরা নিজেরাই যদি বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিকার হয়ে থাকেন তাঁদের ব্যক্তিগত অভ্যাস, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে — তাহলে তাঁরা কোনদিনই এটা আনতে পারবেন না। এবং এ দিকটায় আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলগুলি বাইরের আন্দোলনের ক্ষেত্রে তো বটেই, এমনকী দলের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও কর্মীদের, বিশেষ করে নেতাদের জীবনযাত্রা এবং দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো ও উন্নততর সাংস্কৃতিক মান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র নজর দেননি। এইভাবে তাঁরা শুধু দেশের মানুষকেই ঠকাননি — সৎ ও সরল সাধারণ কর্মীদেরও, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা সব বড় বড় উজির, নাজির, মন্ত্রী হয়ে বসেছেন, তাঁদেরকেও ঠকিয়েছেন। একথা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে।

আমি পূর্বেই বলেছি, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক — এককথায় তার সমস্ত শ্রেণীআকাঙ্ক্ষা পূরণের হাতিয়ার। লেনিন বলেছেন, দল হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন বা বিপ্লবী অংশের সংগঠন, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী। সেইজন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলের নেতারা সর্বহারা সংস্কৃতির প্রাণবস্তু (cream)। তাঁরা তো তাঁদের আচার আচরণে, জীবনযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে, তা সে ব্যক্তিগত জীবনেই হোক্ কিংবা কোন সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেই হোক্, সর্বহারা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কৃতিকেই প্রতিফলিত করবেন। **এই সর্বহারা শ্রেণী সংস্কৃতির মূল কথা কী? এর মূল কথা হচ্ছে, এই সংস্কৃতিকে যে আয়ত্ত করেছে, সমস্ত প্রকার সম্পত্তিবোধ থেকে সে মুক্ত। এই সম্পত্তিবোধ বলতে তার সংস্কৃতিগত, রুচিগত ধারণা ও প্রাত্যহিক আচরণগুলিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা**

থেকে মুক্ত, অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাব থেকে মুক্ত। কমিউনিস্ট সংস্কৃতি বোঝাতে গিয়ে তাই মার্কস যা বলেছেন, তার মর্মার্থ হল, এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত মানবতাবাদ (It is humanism minus private property)। তাই কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বহারা বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট হওয়ার মূল সংগ্রামটি হ'ল সর্বপ্রথমে শোষিত মানুষের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি আয়ত্ত করার সাথে সাথে এই সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মান অর্জন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে এবং বিপ্লবী দলের স্বার্থে বিপ্লবী দলের কাছে ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে নিঃসংশয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে আনন্দের সাথে বিসর্জন দিতে পারার সংগ্রাম। এখানে সর্বদা ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগের সঙ্গে বুর্জোয়া অর্থে 'দেশের জন্য গাড়ি, বাড়ি, ধনসম্পত্তি, জীবনের সবকিছু পরিত্যাগে'র একটা মূলগত পার্থক্য আছে। কারণ, এই ত্যাগটা যদি বুর্জোয়া চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে তার দ্বারা অহম্‌বোধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও হামবড়া ভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তা কমিউনিস্ট হওয়ার পথে চূড়ান্ত বিপত্তি সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রাম যে যথার্থভাবে শুরু করল সে কমিউনিস্ট চেতনার অধিকারী হওয়ার সংগ্রাম শুরু করল মাত্র এবং এ সংগ্রামে সফলতা অর্জন করার পথেই একমাত্র সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

আমাদের দেশের কমিউনিস্ট নামধারী নেতাদের আচরণে উন্নত সংস্কৃতিগত মানের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় না

আমাদের দেশের কমিউনিস্ট নামধারী নেতাদের আচরণে কি এই উন্নত সংস্কৃতিগত মানের কোন প্রতিফলন দেখতে পান? আমি সাধারণ কর্মীদের কথা বলছি না। কারণ তাঁরা তো সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামে লিপ্ত আছেন মাত্র। কিন্তু যাঁরা পার্টির নেতা, যাঁদের উন্নততর সংস্কৃতিগত মান আয়ত্ত করার মধ্য দিয়েই তবে কমিউনিস্ট পার্টির মতো একটি বিপ্লবী দলের নেতা হবার যোগ্যতা অর্জন করার কথা, তাঁদের মধ্যে এমন অনেক নেতা আছেন যাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে বাড়ি আছে, নিজস্ব গাড়ি আছে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য পোশাক পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা ছাড়াও বিলাতে যাবার এবং 'টি পার্টি'তে যোগ দেবার জন্য বাড়িতে তুলে রাখা আলাদা পোশাক আছে। অথচ তাঁরা সাধারণ মানুষ বা শ্রমিক চাষীর কাছে যাবেন সাধারণ পোশাক পরে যেন কতবড় ত্যাগী পুরুষ! গান্ধী থেকে শুরু করে আমাদের দেশের অধিকাংশ স্বদেশী নেতারাই হাঁটুর ওপর কাপড় পরে এদেশে দেশপ্রেমের ট্র্যাডিশনটা দাঁড় করিয়েছেন চমৎকার! দেশের সাধারণ মানুষ এত সব খোঁজ রাখে না, দেখতে যায় না এদের বাড়ি আছে কিনা বা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনধারা কী। যে সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবিটি পরে নেতারা মিটিংয়ে আসেন, এধরনের কতজোড়া ধুতি-পাঞ্জাবি তাঁদের আছে, এতসব তারা দেখতে যায় না। তারা মনে করে, এতবড় একজন নেতা হয়েও যখন এরকম সাধারণ লোকের মতো জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ান, তখন উনি নিশ্চয়ই মস্তবড় দেশপ্রেমিক। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনোভাবনা এবং মানসিকতা আজও এইরকম। আমাদের দেশ হচ্ছে গুরুবাদী দেশ, ত্যাগের ধর্ম এদেশের সনাতন ধর্ম। সাধারণ মানুষকে ঠকাবার এর চাইতে সহজ রাস্তা আমাদের দেশে আর কিছু নেই। বুর্জোয়া রাজনীতিকরা জনসাধারণের এ মানসিকতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করেছে;আমাদের দেশের এই তথাকথিত কমিউনিস্টরাও সেই একই ভন্ডামির আশ্রয় নিয়ে সাধারণ মানুষকে আজও ঠকাবার চেষ্টা করছে। আমি বলি, যদি তাঁদের পয়সা থাকেই, না থাকে আলাদা কথা, নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা যখন তাঁরা অন্যায় মনে করেন না এবং অনেক নেতারই যেখানে প্রচুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি রয়েছে, তখন লোককে ঠকাবার জন্য সাধারণ জামাকাপড় পরে, চপ্পল পরে, সাধু সেজে মানুষ ঠকাবার চেষ্টা কেন? অনেক নেতারই ব্যক্তিগত জীবন, বাড়ি-ঘর এবং সম্পত্তির খোঁজ নিলে দেখা যাবে, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁদের। তাঁরা ছেলেপিলেকে মানুষ করেন বড়লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের যেভাবে মানুষ করে তেমন ভাবে, তাঁদের স্ত্রীরা জীবনযাপন করেন তেমনভাবে। এইসব নেতাদের মধ্যে আবার অনেকে পার্টি ফান্ডে অনেক টাকা চাঁদা দেন। জনসাধারণ এমনকী পার্টি কর্মীরাও নেতাদের এইসব আচরণ বিচার করে দেখেন না। বরং, তাঁরা গর্ব করে বলেন, অমুক নেতা এত টাকা পার্টিতে সাহায্য করেন, এত লক্ষ টাকা পার্টিতে চাঁদা দিয়েছেন। যেন কত বড় ত্যাগী পুরুষ! তিনি পার্টির জন্য বহু টাকা দেন। তাঁর সম্পত্তি অনেক, ফলে আয়ের একটা অংশ তিনি দেন। কিন্তু পার্টি কর্মীরা প্রশ্ন করেন না, পুরোটা তিনি দিয়ে দেননি কেন? তিনি তো একজন একনিষ্ঠ বিপ্লবী, একজন কমিউনিস্ট, যিনি মনে করেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি অন্যায়ের ওপর, অত্যাচারের ওপর

ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদের জন্য লড়াই করছেন, সামাজিক মালিকানা চাইছেন। তাহলে যিনি বিপ্লবের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে পারেন বলে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান, তাঁর তো তুচ্ছ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনায়াসেই বিপ্লবের জন্য দিয়ে দেওয়ার কথা। তাহলে কিসের জন্য তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি রেখেছেন? পুরোটাই পার্টিকে দেননি কেন? এ সব প্রশ্ন করলে হয়তো বলবেন, দিতে কোন আপত্তি নেই, পার্টি চাইলেই দিয়ে দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পার্টি চাইবে কেন? তিনি না বিপ্লবী — যিনি বিপ্লবের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ? তাহলে স্বেচ্ছায় নিজের থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত একটা তুচ্ছ জিনিস তিনি পার্টিকে দিয়ে দেননি কেন? তাঁর কাছে পার্টির চাইবার প্রয়োজন কী? পার্টি চাইবে কি চাইবে না সেটা পার্টি তার প্রয়োজন এবং নানাদিক থেকে ভেবে ঠিক করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এইসব নেতারা বিপ্লবের জন্য বক্তৃতায় জীবন-মান সর্বস্ব দিতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্দ্বিধায় বিপ্লবের কাজে দিয়ে দিতে পারেন না। এইসব নেতাদের দ্বারা আর যে কাজই হোক্ না কেন, বিপ্লবী দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার মতো গুরুদায়িত্ব কোনমতেই এঁদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না।

নেতাদের আচরণে এইসব দেখে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের মধ্যে আজও এই ধারণা বর্তমান আছে যে, রাজনীতি তাদেরই পোষায় যাদের ঘরে খাবার আছে যারা বড়লোক। আমরা ছোটবেলায় শুনেছি, আমার বাবাও আমাকে বলেছেন, যাদের ঘরে খাবার আছে, তাদেরই পোষায় দেশের জন্য লড়াই করা। আজও গরিব মানুষ, মধ্যবিত্তদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা কমিউনিস্ট আদর্শকে পছন্দও করেন, যাঁরা মনে করেন কিছু করা দরকার, তাঁরাও এইসব তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাদের আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা দেখে মনে করেন, রাজনীতি তাঁরাই করতে পারেন — এইসব নেতারা — যাঁরা নিশ্চিন্ত, যাঁদের অবস্থা ভাল। এর দ্বারা সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের যেটা সংগ্রামী তেজ, যেটা প্রাণ, যেটা মহান দিক, সেটাই তাঁরা নষ্ট করে দিচ্ছেন।

এইসব নেতারা দেশের যুবক-যুবতীদের, ছাত্রদের বিপ্লবের আহ্বান দেবেন। তাদের বলবেন, লড়ো, জেলে যাও, লাঠি খাও, গুলি খাও। আর নিজের ছেলেমেয়েদের বলবেন, ভাল করে আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, তারপর যা ভালো বুঝবে করবে। তাঁরা নিজের ছেলের জন্য একটা ভালো চাকরি এবং মেয়ের জন্য ভালো পাত্র খুঁজবেন, আর দেশের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবের জন্য লড়তে বলবেন। নেতাদের এইসব ভন্ডামির জন্যই এতবড় একটা মহান আদর্শ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনের বেড়াজালেই আটকা পড়ে রইল, দেশের মানুষকে আজও বিপ্লবের প্রেরণায় তেমন করে উদ্বুদ্ধ করতে পারল না।

আমাদের দেশে এমন অনেক কমিউনিস্ট নেতা আছেন যাঁরা বাইরে খুব দিলখোলা সাদাসিধে ভাব দেখান, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে, বাড়িতে আরামে জীবনযাপনের ব্যাপারে, অন্যান্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে, পারিবারিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, ছেলেমেয়ে মানুষ করার ক্ষেত্রে তাঁদের টনটনে জ্ঞান। তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করছেন, অথচ মজুর-চাষী, সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছেন অত্যন্ত সাধারণভাবে। এইভাবে বুর্জোয়া ভন্ডদের মত মজুরদের কাছে ব্যক্তিগত জীবনকে আড়াল করে রেখে মহাত্যাগী পুরুষ সেজে যাওয়ার অর্থ কী? এ তো মজুর ঠকানো। এ তো দেশের মানুষকে ঠকানো। দেশের তথাকথিত বামপন্থী ও সাম্যবাদী নেতারা দেশের মানুষের প্রশংসা কুড়োবার ব্যগ্রতায় এই পথেই কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচার করছেন।

আবার, আর এক ধরনের এমন নেতাও আছেন যাঁদের হয়তো এসব কিছুই নেই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে, তাঁরা তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে দলের কাছে অনেক কিছু চান। কেউ নেতৃত্ব চান, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নানা অসুবিধায় পড়লে তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন — কারণ তাঁরা আরাম চান। দল যদি প্রয়োজনবোধে স্বাভাবিকভাবেই কাউকে একটু ভালো খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিতে পারে তিনি সেইভাবেই থাকবেন, কিন্তু আরামের প্রতি তাঁর লোভ জন্মাবে না, আবার খারাপভাবে থাকলেও তিনি তা নিয়ে আক্ষেপ করবেন না — এইরকম মানসিকতাই হচ্ছে সঠিক বিপ্লবী মানসিকতা। কিন্তু এই সমস্ত নেতারা তাঁদের অশেষ (!) ত্যাগের বিনিময়ে কিছু চাইছেন। আর, এই কিছু পাবার জন্য, তা নেতৃত্বই হোক্, আরাম-আয়েসই হোক্, তাঁরা দলের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁদের মনোভাব অনেকটা এইরকম যে, যেহেতু তাঁরা অনেক ত্যাগ করেছেন, অনেক পরিশ্রম করেছেন, দলের জন্য সর্বস্ব দিয়েছেন, অতএব এখন তাঁরা দলের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার অধিকারী; জনসাধারণ ও দলের এগুলি দেবার ক্ষমতা আছে কি নেই, তা বিচার পর্যন্ত তাঁরা করছেন না। এই ত্যাগের ধারণা থেকেই আসে তাঁর কিছু চাওয়ার মনোভাব। এই চাওয়ার প্রকৃতি ভিন্ন লোকের ভিন্ন ধরনের। কেউ চায় টাকাপয়সা, কেউ চায় নাম, কেউ করে নেতৃত্বের দাবি, কেউ বড়

নেতা হতে চায়, তার জন্য কোন্দল করে, আবার কেউ চায় ইচ্ছামতন চলার লাইসেন্স। এ সবগুলোর পেছনেই কাজ করছে বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও ব্যক্তিবাদের প্রভাব।

আপাত দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে যে শান্তি ও আনন্দ, সাধারণ মানুষের আরামের মধ্যে তার হদিশ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব

প্রথমেই বোঝা দরকার কমিউনিস্ট আদর্শ ত্যাগের আদর্শ নয়। আমরা কিছুই ত্যাগ করিনি। একটা ক্ষুদ্র নোংরা জীবন ছেড়ে দিয়ে একটা বৃহত্তর-মহত্তর জীবন গ্রহণ করেছি মাত্র। একে কি কেউ ত্যাগ বলবে? ত্যাগ মানে কী? ধরুন, আপনি এখন কুঁড়েঘরে বাস করেন। আপনাকে এর বিনিময়ে একটা রাজপ্রাসাদ দিয়ে দেওয়া হল, আর আপনি আপনার ভাঙা স্যাঁতসেতে নোংরা কুঁড়েঘরটি ছেড়ে রাজপ্রাসাদে বসবাস শুরু করলেন। আপনার এ কুঁড়েঘর ছেড়ে আসাকে কি আপনি ত্যাগ মনে করবেন? কেউই করে না, আপনিও করবেন না। কারণ, ত্যাগ তো হচ্ছে কোন কিছু না চেয়েই কিছু ছাড়া অথবা সবকিছু দিয়ে দেওয়া। এ কি তাই? আসলে তো আপনি যত ছেড়েছেন, পেয়েছেন তার অনেক বেশি। কমিউনিস্টরা তাদের বিপ্লবী জীবনকে এই রাজপ্রাসাদের জীবনের থেকেও বৃহত্তর সম্পদ বলে মনে করে। যে জীবনটাকে সে ছেড়ে এসেছে, একজন বিপ্লবীর কাছে সেটা কুঁড়েঘরের জীবনের মতো শুধু দুঃখময় ও নোংরাই নয় — ক্ষুদ্র, নীচ এবং অবমাননাকর। তাই এই দিক দিয়ে বিচার করলে একজন সত্যিকারের বিপ্লবী কিছুই ত্যাগ করেনি। বরং যা সে ছেড়ে এসেছে, অর্থাৎ গাড়ি-বাড়ি, টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, আরাম-আয়েস; তার তুলনায় সে হাজার লক্ষ গুণ বড় জিনিস পেয়েছে — সে তার আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে পেয়েছে। **বিপ্লবীদের অভাব অনটন, হাজার দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন যা দেখে সাধারণ মানুষ তাদের জন্য দুঃখ করে, সেই আপাতদৃষ্ট দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকে একজন বিপ্লবী যে শান্তি এবং আনন্দ খুঁজে পায়, সাধারণ মানুষ বাড়ি, গাড়ি, আরামের মধ্যে তার হদিশ খুঁজে পায় না। বিপ্লবের থেকে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের থেকে বড় জীবন তার আর কিছুই নেই।** তাই, বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবী জীবনকে গ্রহণ করতে গিয়ে কোন কিছু ছেড়ে আসাকেই সে ত্যাগ বলে মনে করে না এমনকী তার নিজের জীবনও নয়। তাই যদি না হত, যা তারা ছেড়ে এসেছে তার প্রতি যদি তাদের এতটুকু মমত্ব এতটুকু ক্ষোভ বা ব্যথাও কোথাও জমা হয়ে থাকত. তাহলে চীনের বিপ্লবীরা একটানা তিরিশটা বছর ধরে বনে-জঙ্গলে এমন করে মরণপণ সংগ্রাম করতে পারত না। বিপ্লবী জীবনের মধ্যে একটা উঁচুদরের মর্যাদাবোধ এবং আনন্দের সন্ধান না পেলে ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর ধরে এতবড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জোর খুঁজে পাচ্ছে কোথায়? **এই বিপ্লবী জীবনের আকাঙ্ক্ষা একজনের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিলে তবেই কেবলমাত্র সে বিপ্লবী হতে পারে।** আর আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা কিছু ছাড়তে হলেই মহাত্যাগ করছেন বলে মনে করেন। কী তাঁরা ত্যাগ করেছেন? গাড়ি, বাড়ি, ধন-সম্পত্তি, আরাম — এই তো? গান্ধীবাদীরা এদেশে সেই অর্থে অনেক বেশি ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁরা একে ত্যাগ মনে করেন কেন? যদিও একথা ঠিক একজন সত্যিকারের বিপ্লবী যখন বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসে, সাধারণ মানুষের জীবনের চাহিদাগুলি যখন তাঁর কাছে অপাংক্তেয় হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষ কমিউনিস্টদের, যাঁরা সবকিছু ছেড়ে বিপ্লবী সংগ্রামে জীবনকে নিয়োজিত করেছেন, তাঁদের সাধারণ অর্থে মহাত্যাগী বলে মনে করেন। কিন্তু একজন কমিউনিস্ট ত্যাগ অর্থে এই জিনিসটাকে নেবেন কেন? তাহলে বিপ্লবের তুলনায় এই বাড়ি, গাড়ি, ধন-সম্পত্তি, আরাম — এগুলোকেই তাঁরা বেশি মূল্যবান বলে মনে করেন — অর্থাৎ এগুলোর প্রতি তাঁদের মনের গোপন কোণে প্রবল আকর্ষণ বিদ্যমান। তাই, যাঁরা দেশের জন্য এত ত্যাগ করলেন বলে মনে করেন, বিনিময়ে তাদের আসে কিছু চাওয়ার মনোভাব — তা ধন-সম্পত্তিই হোক্ বা ক্ষমতা-পদই হোক্। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরাও এই ত্যাগের বিনিময়ে আজ কিছু চাইছে। তাদের ত্যাগ আজ গোটা দেশের ওপর বোঝা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অবশ্য একথাও ঠিক, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ধন-সম্পত্তি বা ক্ষমতা-পদ এসব কিছুই চাইছেন না, তাঁরা বিপ্লবটাই চাইছেন। কিন্তু তাঁদেরও মনোভাবনা এইরকম যে, তাঁরা বিপ্লবের জন্য ব্যক্তিগত অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন বা করছেন। ত্যাগের এই মনোভাব মনের মধ্যে থেকে গেলে কী হয়? বিরুদ্ধ এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়লে, অথবা সংগ্রামের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ না হলে তাঁরা ধীরে ধীরে মানুষের

ক্ষমতার (human efforts) ওপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। যাঁরা গাড়ি-বাড়ি চাইছেন না, ক্ষমতার লোভ বা দ্বন্দ্বের মধ্যে আসতে চাইছেন না, তেমন গান্ধীবাদীদের কি পরিণতি হয়েছে আমাদের দেশে? যদিও তাঁরা ব্যতিক্রম — ব্যতিক্রম ঐ ত্যাগীদের মধ্যে — কিন্তু মানুষের প্রতি, মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সংগ্রামের প্রতি তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। তাঁরা এক ধরনের 'সিনিক'। কাজেই, ত্যাগধর্মের এই দু'টি চরম পরিণতি। হয় ত্যাগের বিনিময়ে আসে কিছু চাওয়ার মনোভাব — সেটা যে রূপেই হোক্, আর না হয় সময়ের গতিপথে যদি জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সফলতা না আসে, তাহলে সংগ্রামের জটিল অবস্থায় ব্যর্থতার সামনে এসে হতাশা দেখা দেয়, তাঁরা মানুষের সমস্ত ক্ষমতা এবং সংগ্রামের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। আর এইরকম অবস্থায় তাঁদের একদিনের বিপ্লবী চরিত্রের গুণাবলীগুলিও মরতে থাকে এবং সেই অর্থে পূর্বের তুলনায় জীবনের ক্ষেত্রে অধঃপতনও ঘটতে থাকে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, যারা গাড়ি-বাড়ি-সম্পত্তি চাইল না ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নামল না বা বিনিময়ে ব্যক্তিগত কিছু চাইল না, তাদের ক্ষেত্রেও যদি ত্যাগ সম্পর্কে যথার্থ মার্কসবাদ সম্মত ধারণা না থাকে, তাহলে কী হয়? তাঁরা সব কিছু দেখে শুনে হতাশ হয়ে যান, মানুষের সমস্ত ক্ষমতা এবং সংগ্রামের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন অথবা 'সিনিক' হয়ে পড়েন।

ত্যাগের আদর্শের মনোভাবের মধ্যে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়

আপনাদের মনে রাখতে হবে, ত্যাগের আদর্শ বিপ্লবী আদর্শ নয়। তাই আমি যে কথা বলছিলাম — আমরা কিছুই ত্যাগ করিনি। একটা ক্ষুদ্র, সাধারণ ও নোংরা জীবন ছেড়ে দিয়ে আজকের দিনের বৃহত্তম এবং মহত্তম জীবন গ্রহণ করেছি মাত্র। কেননা আমরা জানি, ঐ সাধারণ জীবনটা না ছাড়তে পারলে এই বিপ্লবী জীবনটা পাওয়া যায় না। তাই এই ছাড়াটা আমাদের কাছে ত্যাগ নয়, কোনও সত্যিকারের বিপ্লবীর কাছেই নয়। অন্যদিকে, কানি পরা বা ঝুপড়িতে থাকাটা তো আর শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার আদর্শ নয়। এ তো আমাদের দেশের পুঁজিবাদী শোষণের ফল হিসাবেই তাদের জীবনে দেখা দিয়েছে। ফলে পুঁজিবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে একদিকে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ততা, অন্যদিকে সংস্কৃতিগতভাবে বুর্জোয়া প্রভাব এবং অশিক্ষার দরুন তাদের মধ্যে যে জীবনযাত্রা, যে সংস্কৃতিগত, যে রুচিগত মান প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটা বিপ্লবী সর্বহারা সংস্কৃতি নয়। এতো তাকে এ অবস্থায়, পর্যুদস্ত অবস্থার মধ্যে ফেলা হয়েছে। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে ভালো খাওয়া, ভালো পরা এবং উন্নততর আদর্শ, সংস্কৃতি, রুচি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে উন্নততর জীবনের জন্যই তো তার সংগ্রাম। তবে সেই শ্রমিকের কাছে ছেঁড়া কাপড় পরে ত্যাগের প্রতিমূর্তি সেজে যাবার প্রয়োজন কী? ভালো জামাকাপড় না থাকলে, যা আছে তাই পরেই যেতে হবে। কিন্তু ভালো জামাকাপড় থাকলে, সেটা লুকিয়ে রেখে মিথ্যাচার করার প্রয়োজন কী? এই ধরনের মিথ্যাচারের ফলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে। তারা এতসব বিচার করে না। তারা বরং যদি দেখে, একজন নেতা — যার কিছুই নেই, ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি নেই, সর্বস্ব সে রাজনৈতিক আন্দোলনে দিয়ে দিয়েছে, পার্টির জন্য সবকিছু দিয়ে দিয়েছে, অথচ পার্টির কোন দরদী বন্ধু বা কেউ তাকে একটা 'স্যুট' দিয়েছে, সেই স্যুট পরেই সে ঘুরে বেড়ায়, সারা শীতকাল ধরেই সেই একটা স্যুট-ই ব্যবহার করে — তাকে তারা মনে করে, মস্ত বড় বাবু, বেশ বড়লোক, বেশ পয়সাপাতি আছে। আমি আগেই বলেছি, গান্ধীবাদী স্বদেশী নেতাদের আচরণের ফলে আমাদের দেশে একটা ধারণাই দাঁড়িয়ে গেছে, যদি নেতারা একটু ভাল জামাকাপড় পরেন, প্রয়োজনেও যদি গাড়িতে চড়েন, তাহলেই সব গেল, তাঁরা আর দেশকে ভালোবাসেন না, জনতাকে ভালোবাসেন না। এরকম ধারণা প্রায় সমস্ত মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আবার, কিছু নেতা এগুলিকে সংস্কার বলে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্-এর নজির তুলে নিজেরা গাড়ি-বাড়ি, দামি পোশাক ব্যবহার করছেন — জনসাধারণ ও দলের এগুলি দেবার ক্ষমতা আছে কি নেই, তা বিচার পর্যন্ত করছেন না।

আরামের সামগ্রী না পেলে যেমন বিপ্লবীর কোন দুঃখ থাকবে না, তেমনি পেলেও সেটা মোহের সৃষ্টি করবে না

এ ধারণাগুলোর কোনটাই সঠিক বিপ্লবী ধারণা নয়। একজন সত্যিকারের বিপ্লবী এ বিষয়টিকে কীভাবে দেখে? সে তার ভালো-মন্দ, তার ভবিষ্যৎ, সমস্ত কিছুই বিপ্লবের স্বার্থে স্বেচ্ছায় পার্টি ও জনসাধারণের ওপর ছেড়ে দেয়। পার্টি তার ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে যেমন করে রাখবে, সে আনন্দের সঙ্গে খুশি মনেই সেটা মেনে নেবে। এ নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা থাকবে না। দল যদি তার দু'বেলা খাবার জোগাড়টাও না করে উঠতে

পারে, তাহলে তাকে হয় তা নিজেকেই জোগাড় করে নিতে হবে, আর নাহয় না খেয়েই থাকতে হবে এবং এটা খুশি মনেই, মনের মধ্যে কোন ক্ষোভ না রেখেই করতে পারার মানসিকতা চাই, তবেই সে বিপ্লবী। আবার, পার্টি যদি তাকে ভালো জামাকাপড়, প্রয়োজনে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারে, তাহলে তার প্রতিও তার মোহ বা লোভের সৃষ্টি হবে না, তার দ্বারা সে আমিরি অভ্যাসের শিকার বনে যাবে না ; প্রয়োজন হলে কোন দ্বিধা না রেখেই, একমুহূর্তেই সে সেগুলি পরিত্যাগ করতে পারবে। অর্থাৎ আরামের সামগ্রী না পেলেও যেমন তার কোনও দুঃখ থাকবে না, ক্ষোভ থাকবে না, তেমনি এগুলি পেলেও তার এগুলির প্রতি মোহের সৃষ্টি হবে না। এই হবে একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর মানসিকতা এবং এগুলি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আমি নিজের জীবনেই দেখেছি, গোড়াতে যখন আমরা দল গড়ার কাজ শুরু করেছি, যখন সমর্থনে বিশেষ লোকজন ছিল না, এমনকী মাথা গোঁজার মত ঘরও জোগাড় করে উঠতে পারিনি, যখন না খেয়ে দিনের পর দিন একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমাদের একটি নতুন পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, এ নিয়ে সেদিন কিন্তু আমাদের মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। আমরা কত বছর মাদুরে শুয়েছি, কত শীত-গ্রীষ্ম আমাদের এভাবে কেটেছে। আমাদের তখনকার বন্ধুরা আজও তার সাক্ষ্য বহন করবে। তারা দেখেছে, তখনও আমাদের মনে কোন আক্ষেপ ছিল না। আমরা কতদিন খাইনি, তা নিয়ে আমরা কারোর কাছে কিছু বলতেও লজ্জাবোধ করতাম। কারণ মনে হত, খাওয়া জোগাড় করতে পারিনি, সমর্থক নেই, পাঁচটা পয়সা চাঁদা তুলতে পারিনি, লোকে দেয়নি — এটা আমাদেরই অক্ষমতা। এটার মধ্যে আবার গর্ব করে বলার কী আছে? ত্যাগের কী মাহাত্ম্য আছে? এ বলতেই আমরা লজ্জাবোধ করতাম। এ এক ধরনের মনোভাব আমাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে এনিয়ে কোনও গর্বের মনোভাব ছিল না যে, দেশের জন্য আমরা মস্ত ত্যাগ করছি। বরঞ্চ ছিল কাজের অক্ষমতা ও অসফলতা সম্বন্ধে মনের মধ্যে লজ্জাবোধ। আমি আমার কথাই বলতে পারি, তখনও কমরেডরা আমাকে যেমন হাসতে দেখেছে, যে শক্তিতে কাজ করতে দেখেছে, যে 'মুড'-এ দেখেছে; স্বাস্থ্য, বয়স সেসব প্রশ্ন বাদ দিলে আজও তারা সেইভাবেই দেখে। অথচ আজ অবস্থা কী ? আজ আগের তুলনায় দলের অনেক লোকজন বেড়েছে, আগের চাইতে যোগাযোগ অনেক বেড়েছে, আজ একটু কিছু হলেই দশটা কমরেড ছুটে এসে পড়ে। হয়তো জামা ছিঁড়ে গেছে, দশটা কমরেড দৌড়ে আসে, চোদ্দজন সমর্থক দৌড়ে আসে একটা ভাল জামা বানিয়ে দেবার জন্য। তারা জোর করে, না নিলে দুঃখ অনুভব করে, তাদের মনে লাগে। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? এমনিই নেতাদের মানুষ দেয়। তাদের আরামের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকবে কেন, লোভ থাকবে কেন? আর যদি নেতা হবার পরেও লোকে তাদের কথা না ভাবে, তাহলে বুঝতে হবে, তারা ওপর থেকে পরগাছার মত নেতা হয়েছে। তারা যদি সাধারণ মানুষের প্রতি সত্যিকারের 'সার্ভিস' দেয়, তাহলে এমনিই সাধারণ মানুষ নেতাদের দেয়। কিন্তু এ সম্পর্কে সতর্ক না থাকলে কী হয়? সেগুলো পেতে পেতে, যদি না তার প্রতি একটা নির্লিপ্ত ভাব থাকে, তাহলে তার 'ভিক্‌টিম্' হয়ে যাওয়ার, আরামের শিকার বনে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখনই বিপদের সৃষ্টি হয়। একদিন কেউ কষ্টের মধ্যে আক্ষেপ না করে থাকতে পেরেছে বলেই চিরকাল তার সেই গুণগুলি বজায় থাকবে এমন কোন কথা নেই। কাজেই সবসময় এই সংগ্রাম বিপ্লবীদের নিজের ভিতর করতে হয়, সবসময় তাকে এটা পরীক্ষা করতে হয়, 'টেস্ট' করতে হয়, বুঝতে হয়। কাজেই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে, কোন কিছু পাওয়া নিয়ে, খারাপ ভালো নিয়ে একজন বিপ্লবীর আক্ষেপ থাকবে কেন? কোন কিছু পাক্ বা না পাক্, না পেলে তার এইভাবেই চলবে। কেউ যদি কোন কিছু দেয়, তাহলেও সে সেটা পরবে, সেখানেও কোনরূপ ভন্ডামির আশ্রয় নেবে না। হয় তো আছেই তার একখানা স্যুট, কেউ দিয়েছে, কিন্তু পাছে পরে গেলে লোকে অন্যরকম মনে করে, সেইজন্য লোকের কথা ভেবে ধার করে আর একটা সাধারণ জামাকাপড় পরে ভড়ং করে লোককে দেখাতে যেতে হবে যে, 'আমি কতসাদাসিধে' — এর নাম কী? এর নাম নির্ভেজাল ভন্ডামি। এর নাম হচ্ছে জনসাধারণের মানসিকতার পেছনে পেছনে চলা, জনগণকে শিক্ষিত করা নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের চলবার রীতি কী ? সাধারণ মানুষের যে মানসিকতা, আমাদের চলবার রীতিটা তার থেকে খুব বেশি এগিয়ে গিয়েও যেমন হবে না, আবার তার পেছনে পেছনেও চলব না। অর্থাৎ আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যেই থাকব, কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে বুর্জোয়ারা যে জট সৃষ্টি করে রেখেছে, আমাদের আচরণের দ্বারা সেগুলো ভাঙবার জন্যই আমরা তাদের মধ্যে থাকব। বুর্জোয়া সংস্কৃতির যে জটগুলি জনসাধারণের মানসিকতার মধ্যে, রুচির মধ্যে, চিন্তার 'প্যাটার্ন'-এর মধ্যে সূক্ষ্ম জালের মত জড়িয়ে আছে, শুধুমাত্র বিপ্লবী স্লোগান দিয়ে সেগুলো ভাঙা যাবে না। এটা ভাঙতে হলে যেমন জনসাধারণকে বিপ্লবী

সংগ্রামে নিয়োজিত করতে হবে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে এসে সেগুলোকে ভাঙতে হবে, সাথে সাথে ওই ভাঙার কাজটি পুরো সম্পূর্ণ করা তখনই সম্ভব হবে যখন সংস্কৃতিগতভাবে আচরণের দিক থেকেও আমরা টুকিটাকি সমস্ত ব্যাপারে এই বুর্জোয়া জিনিসগুলো আমাদের ব্যবহারের দ্বারা তাদের মধ্য থেকে দূর করতে সক্ষম হব। একমাত্র তখনই দেখা যাবে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির এইসব প্রভাব, সাধুসন্তদের প্রতি তাদের আকর্ষণ, ত্যাগধর্মের প্রতি তাদের মোহ — এগুলো তাদের মধ্য থেকে দূর হতে থাকবে, এগুলোর সত্যিকারের শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণীগত স্বরূপ তারা বুঝতে সক্ষম হবে। তারা বুঝতে সক্ষম হবে, কোন্ মানুষ 'ডেডিকেটেড', সত্যিকারের আদর্শবান, কোন্টা সত্যিকারের আদর্শ, কোন্ রাস্তাটা সত্যিকারের বিপ্লবী রাস্তা, কিসে তাদের মুক্তি। আর, এ যেদিন তারা বুঝতে সক্ষম হবে এবং যত বুঝতে থাকবে তত বুর্জোয়া রাজনীতির প্রভাব তাদের কাটতে থাকবে, 'স্টান্ট' দেওয়া বিপ্লবীদের প্রভাবও তাদের ওপর তত কমতে থাকবে। কাজেই তাদের মধ্যে যেমন নিয়ে যেতে হবে বিপ্লবী রাজনীতি তেমনি এই রাজনীতির সাথে সাথে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা প্রচন্ড জেহাদের মনোভাব নিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতিকেও তাদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাদের আচরণ জনতাকে সে সম্পর্কে সচেতন তো করছেই না, বরং জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি, রুচি, বিচারধারায় নানাদিক থেকে বুর্জোয়া ভাবধারার যে প্রভাব জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে;এইসব আচরণের দ্বারা, ভন্ডামির দ্বারা সেগুলো টিকিয়ে রাখতেই সাহায্য করা হচ্ছে। আর এইভাবে জনতার মধ্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব যদি টিকে থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে হাজার মারমুখী সংগ্রাম পরিচালনা করা সত্ত্বেও জনতার মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা, বিপ্লবী মানসিকতা ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পথে তা প্রচন্ড বাধা সৃষ্টি করে চলবে।

ব্যক্তিগত আচরণের এই সমস্ত নানা দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেই এইসব তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতারা বলবেন, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁদের দলের সাধারণ কর্মীরাও মনে করে, এটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অর্থাৎ তাঁদের একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে আর একটা রাজনৈতিক ব্যাপার আছে। যেন ব্যক্তিগত জীবনে ধ্যানধারণা, ভালোলাগা, মন্দলাগা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ ও ন্যায়নীতির ধারণাগুলি বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া সম্পর্কবোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়া চলে, শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও-এর কিছু বই মুখস্থ করে গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারলে, আর অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে কিছু কিছু মারমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই সর্বহারা বিপ্লবী বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হওয়া যায়। কমিউনিস্ট হওয়ার মতো কঠিন সাধনা ও জটিল সংগ্রামের বিষয়টিকে এরা কত সহজ করে দিয়েছে। আর এরই ফলে এই দলগুলির পার্টি মেম্বারশিপ দেওয়ার রীতিটাও কত সহজ হয়ে গেছে। কর্মীরা জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে নিয়মিত কাজ করছে কিনা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা এবং জীবন পরিচালনার পদ্ধতি কমিউনিস্ট আদর্শে গড়ে তোলার জন্য আপসহীন সংগ্রাম করছে কি করছে না — সেসব দেখার দরকার নেই। তারা 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' বা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' মানে কিনা, ভোটের সময় পোস্টার মারতে পারে কিনা এবং নির্বাচনে জাল ভোট দিতে পারে কিনা সেটুকু দেখলেই হল। তাই এইসব কমিউনিস্টদের পকেটে কার্ড না থাকলে এদের আচার আচরণ, রুচিগত মান, ব্যক্তিগত ব্যবহার ও জীবনযাত্রা দেখে এরা কমিউনিস্ট কিনা, কেউ বুঝতেই পারবে না।

বিপ্লবী তত্ত্ব তাদের কাছে থেকেই শিখতে হবে,
যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে

তাই আমি দেশের বিপ্লবী কর্মীদের, মজুরদের, যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখতে চান, তাঁদের কাছে বলব, এই বিপ্লবী তত্ত্ব তাদের কাছে থেকেই শিখতে হবে, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে, সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং সফল হয়েছে। যারা ব্যক্তিগত জীবনে আচার, রুচি, অভ্যাসে আজও বুর্জোয়া সংস্কৃতির শিকার, তাদের কাছ থেকে আপনারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখবেন না। কারণ, তারা মার্কসবাদের নামে যা শেখায়, বিপ্লবের নামে যা শেখায়, তা আসলে ভুল শেখায়। রাজনৈতিক বুক্নির বাইরে ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে যারা করে বেড়ায়, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে যেমন নেতার যেমন কর্মীর যা ইচ্ছে যাদের ব্যাখ্যা থাকে, তেমন করে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির চলতে পারে, মার্কসবাদী পার্টির এভাবে চলার রীতিও না এবং চলতে পারেও না। এবং যে পার্টি মার্কসবাদের নামে

এমনভাবে আচরণ করে, বুঝতে হবে, সে পার্টি আসলে মার্কসবাদের তক্‌মা এঁটে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি। তারা বিপ্লবের নামে যে সংগ্রাম করে তা বিপ্লব নয় এবং বিপ্লবের নামে যা বলে তা শুধু বুক্‌নি মাত্র, বুলিসর্বস্বতা মাত্র, তার মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্বের প্রাণ নেই, বিপ্লব নেই। কাজেই তাদের কাছ থেকে মার্কসবাদ শিখতে গেলে তা মার্কসবাদের নামে আসলে অন্য জিনিস শেখা হয়। আর এরই ফলে 'মার্কসবাদ' 'মার্কসবাদ' বলে যে জিনিসের চর্চা এদেশে চলেছে, তাতে বিপ্লবী মার্কসবাদের চর্চা হয়নি, সাম্যবাদের সত্যিকারের তত্ত্ব, সংস্কৃতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা হয়নি এবং এইসব তথাকথিত মার্কসবাদীদের কার্যকলাপ ও আচরণের জন্যই মার্কসবাদের মতো, কমিউনিজমের মতো একটা অমন উচ্চ মহান আদর্শের মর্যাদাও জনসাধারণের চোখে আজ অনেকখানি হেয় হয়ে পড়েছে। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যদি শিখতেই হয়, বিপ্লবী তত্ত্ব যদি আয়ত্ত করতেই হয়, তাহলে তেমন নেতা এবং তেমন দলের কাছ থেকেই শিখবেন যাদের কর্মী ও নেতাদের জীবনটাও বিপ্লবীর মতো। যাদের বুক্‌নিটা শুধু বিপ্লবের, কিন্তু জীবনটা পেটিবুর্জোয়ার বা বুর্জোয়ার মতো, যারা ক্লাস নেয় বিপ্লবের, অথচ যাদের আচরণ, রুচি এবং সামাজিক সম্পর্কের ধরনগুলো বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত, ব্যক্তিগত জীবনের নানা ব্যাপারে আচরণের ক্ষেত্রে যাদের মার্কসবাদী দর্শনগত চিন্তার সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই এবং সেই অনুযায়ী পরিচালিত নয়, অন্তত তেমনভাবে পরিচালনা করার জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা সংগ্রাম চালাতে চাইছে না, তেমন বুক্‌নিসর্বস্ব বিপ্লবীদের কাছ থেকে আমার অনুরোধ আপনারা অন্তত বিপ্লবের তত্ত্ব এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখবেন না। এই ধরনের নেতাদের থেকে আপনারা যত দূরে থাকেন, তাদের গরম গরম বিপ্লবের বুলি থেকে আপনারা যত দূরে থাকেন, তত সত্যিকারের বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে মঙ্গল এবং আপনাদের পক্ষেও মঙ্গল।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোর সংযোজনের মধ্য দিয়েই সঠিক বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব

আপনাদের মনে রাখা দরকার, কমিউনিস্ট হওয়ার সাধনা একটি কঠিন সাধনা। এই বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে একটা সর্বব্যাপক আন্দোলন যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোকে 'ইন্টিগ্রেট' করে, অর্থাৎ সংযোজিত করে গড়ে ওঠে। এই ইন্টিগ্রেশনটি ঘটাতে পারলে তবেই সর্বহারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। তা নাহলে হাজার লড়ালড়ির মধ্যেও শেষ পর্যন্ত শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক ক্ষমতার অভ্যুত্থান এবং সংগ্রামের হাতিয়ার জনতার নিজস্ব বিপ্লবী সংগঠনগুলো গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনে নেতাদের তো বটেই, এমনকি কর্মীদেরও সাধনার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমস্ত জীবনকে ব্যাপ্ত করেই এই বিপ্লবের প্রক্রিয়াটা গড়ে তুলতে হবে। এই সংগ্রাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে — ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন, এমনকী যৌনতা-ভালোবাসা পর্যন্ত — সমস্ত কিছু ব্যাপ্ত করেই কমিউনিস্ট হওয়ার এই মহান সংগ্রাম।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান সমাজে যে ন্যায়নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ বা যে মূল্যবোধের দ্বারা আজও পরিচালিত হই, মনে রাখতে হবে, সে সবগুলোই বুর্জোয়া নৈতিকতার ধারণা এবং এই নৈতিকতাগুলোর পরিবর্তে কমিউনিস্ট নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত সচেতন সংগ্রামের দ্বারাই, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি যাকে আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলি তা গড়ে তোলার বিরামহীন সঠিক সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র আমরা নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। এই সংগ্রাম পার্টির অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত একটি জীবন্ত সংগ্রামের রূপ নেওয়া দরকার এবং পার্টির বাইরেও এই আদর্শ এবং সংস্কৃতিগত ক্রান্তি যা আমাদের দেশের বিপ্লবের পরিপূরক মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, তার আন্দোলন সাথে সাথে গড়ে তোলা দরকার। এখানে একটা কথা সবসময়ই মনে রাখা দরকার যে, এককভাবে দলের বাইরে থেকে এই সংগ্রাম পরিচালনা করা কখনই সম্ভব নয়, যৌথ সংগ্রামই হচ্ছে এর একমাত্র গ্যারান্টি।

এখন বিচার করে দেখা যাক্ যে, আমরা মার্কসবাদী দর্শনকে আমাদের জীবনদর্শন হিসাবে মেনে নেওয়ার সাথে সাথেই কি আমরা কমিউনিস্ট হয়ে যাই? লেনিন বলেছেন — না, তার দ্বারা আমরা কমিউনিস্ট হওয়ার ইচ্ছাকে প্রকাশ করি মাত্র। যে সংগ্রামটির কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, পার্টির

অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট হওয়ার যে বিরামহীন সংগ্রাম তার কাছে নিজেকে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করে সচেতনভাবে সে সংগ্রামটি পরিচালনা না করলে কিছুতেই কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। অথচ কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা কমিউনিস্ট হওয়ার এই মূল সংগ্রামটি এড়িয়ে গিয়ে পার্টি গঠনের চেষ্টা করেছেন। **ফলে পার্টি নেতৃত্ব যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির গুণসম্পন্ন একটি যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দেবার পরিবর্তে আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে পর্যবসিত হয়েছে এবং পার্টিকে তাঁরা একটি গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টির পরিবর্তে সাধারণভাবে গৃহীত রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক গ্রুপগুলির একত্র সংগ্রামের একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেছেন।**

এ সম্পর্কে অনেকের মধ্যে এমন ধারণা আছে যে, নেতারা সব পেটিবুর্জোয়া পরিবার থেকে এসেছেন বলেই পার্টি নেতৃত্ব এরকম হয়েছে। অর্থাৎ নেতারা শ্রমিকশ্রেণীর পরিবার থেকে এলেই যেন সঠিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারতেন এরকম একটা ভুল ধারণা অনেকে পোষণ করে থাকেন। কিন্তু এটা যদি সত্য হত, তাহলে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সে-তুঙ এদের কারোরই কমিউনিস্ট হবার উপায় ছিল না। কারণ এরা সকলেই পেটিবুর্জোয়া পরিবার থেকে এসেছেন। এই ধারণা সত্য হলে, ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি-ই সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারত। কারণ এই পার্টির নেতারা সকলেই শ্রমিক পরিবার থেকে এসেছেন এবং গোড়াতে এই পার্টির নেতারা নিজেদের পুরোপুরি মার্কসবাদী বলেই ঘোষণা করতেন। অথচ এই পার্টি সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা কী? ইংল্যান্ডের এই লেবার পার্টি সেখানকার একচেটিয়া পুঁজির নির্লজ্জ দালালি করছে। আমাদের দেশেও একসময়ে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার এই ধরনের ভ্রান্ত মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই লেবার পার্টি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তার দ্বারা সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকী আমাদের দেশের বলশেভিক পার্টির, যার অস্তিত্ব আজ আর নেই বললেই চলে, তার গোড়ার কথা কী ছিল যা নিয়ে একসময়ে প্রচুর শ্রমিককে তারা দলে টেনেছিল? তাঁরা বলতেন, 'বাবুদের দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দল হবে না। প্রোলেটারিয়েটদের নিয়ে পার্টি গঠনের চেষ্টা এদেশে হয়নি, তাই সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে গড়ে ওঠেনি। লেনিন বলে গিয়েছেন, প্রোলেটারিয়ান পার্টিতে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে সমস্ত কমিটিতে মেম্বারশিপের শতকরা ষাট ভাগ আসবে শ্রমিকশ্রেণীর পরিবার থেকে। যদি তা না আসে, তাহলে তার গ্যারান্টি নেই। ফলে শ্রমিকশ্রেণী থেকে আসা কমরেডদের নেতৃত্বে এদেশে সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির জন্ম দিতে হবে।'

লেনিন একটা পার্টিকে শ্রেণীগত ভিত্তির দিক থেকে পাকাপোক্ত করার আদর্শের দিক থেকে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। যদি কোন পার্টিতে এমন অবস্থা হয় তাহলে ভালো। কিন্তু লেনিন বাস্তববাদী ছিলেন। তাই লেনিন একই সাথে পশ্চাৎপদ দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নে শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবীর ('ডি-ক্লাসড্ ইনটেলিজেনশিয়া'র) তত্ত্বটিও তুলে ধরেছিলেন। এঁরা লেনিনের এই তত্ত্বটি সম্পর্কে কোন গুরুত্বই দেননি। বাস্তবেও আমরা লেনিনের নিজের পার্টি, যে পার্টি রাশিয়ার সর্বহারা ক্রান্তি সফল করেছিল, তার অবস্থা কী দেখতে পাই? চীনের পার্টির অবস্থা কী? এইসব পার্টিতে নেতা ও কর্মীরা বেশীরভাগই পেটিবুর্জোয়া পরিবার থেকে এসেছেন। কারণ এই সমস্ত পশ্চাদপদ দেশগুলিতে সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি নানা কারণের জন্য স্বভাবতঃই বেশিরভাগ পার্টি কর্মীরা আসবে গ্রামীণ এবং শহরের বুদ্ধিজীবী নিম্নমধ্যবিত্ত পেটিবুর্জোয়া পরিবার থেকে। এবং এইজন্যই পার্টির শ্রেণীচরিত্রের গ্যারান্টি গড়ে তোলার জন্য 'ডি-ক্লাসড্ প্রোলেটারিয়ান রেভোলিউশনারি' হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রামটি পার্টি গঠনের প্রশ্নে এইসব দেশে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বরঞ্চ একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে গেলে প্রথমোক্ত সম্ভাবনার একটা বাস্তব ভিত্তি আছে। কিন্তু পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে এর বাস্তব স্থিতিই নেই। লেনিনের প্রথমোক্ত উক্তিটির ভিত্তিতে 'শুধু মজুরদের নিয়েই পার্টি গড়তে হবে' — এই তত্ত্বটির মানে বাস্তবে এদেশে দাঁড়াবে, দুটো বাবু বুদ্ধিজীবী যাঁদের সাথে শ্রমিকদের বুদ্ধিগত পার্থক্যটা বিরাট, তাঁরা শ্রমিকদের শ্রমিক হিসাবে যে 'ইগো' থাকে তাকে উত্তেজিত করে আসলে ব্যক্তিনেতৃত্বই চালিয়ে যাবেন। কারণ দলের নেতৃত্বে আরও বুদ্ধিজীবীরা এলে যদি নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় — এই ভয়ে তাঁরা উপরোক্ত যুক্তির আড়ালে দলের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের মধ্যে অধিক সংখ্যায় বুদ্ধিজীবীদের ঢুকতেই দিতে চান না।

মজুরের ছেলে নেতৃত্বে এলেই বিপ্লব সফল হবে — এ ধারণা ভুল

দ্বিতীয়ত, 'মজুরের ছেলে নেতৃত্বে এলে তবে বিপ্লব হবে' — এই ধারণার দ্বারা তাঁরা অপর একটি ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছেন। এই ধারণার মধ্যে কোথায় ত্রুটি আছে, তা তাঁরা ধরতে পারেননি। তাঁরা ধরতে পারেননি যে, একজন শ্রমিক শুধু শ্রমিক বলেই সাথে সাথে বিপ্লবী হয়ে যায় না। কারণ, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে একজন শ্রমিকের যে অবস্থান, সেখানে তার চিন্তাভাবনা, তার মনন, তার সংস্কৃতি, আচরণ, অভ্যাস — এ সবই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এমনকী বিচার করলে দেখা যাবে, তার মনের মধ্যে যে 'ওয়ার্কার্স কমপ্লেক্স'-টা কাজ করে, তাও বুর্জোয়া শ্রেণীগত চেতনার কাঠামোর মধ্যেই মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষাকে কেন্দ্র করে এক একটি 'কমপ্লেক্স' মাত্র। অথচ সর্বহারা শ্রেণীচেতনার রূপই তা নয়। সর্বহারা শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন লোকের বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে লড়াইটা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক শ্রেণী লড়াই (impersonal class fight)। বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের চেতনাটা — সে নিজে বড়লোক নয় বলে সেই ঈর্ষার থেকে জন্ম নয়। এমনকী তার আর্থিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াইয়ের চরিত্রও ব্যক্তিগত নয়, তা 'ইমপারসোনাল'। তার ঘৃণাটা হচ্ছে শ্রেণীর বিরুদ্ধে — ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত নয়। ঘৃণাটা যদি ব্যক্তিগত হয়, শ্রেণীগত চেতনার থেকে যদি তার জন্ম না হয়, তাহলে একজন শ্রমিকও অনুকূল পরিবেশে এবং অবস্থায় একজন বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন, ব্রাহ্মণরা একসময় নিচুবর্ণের লোকদের শাস্ত্রের ধূয়া তুলে শোষণ করেছে সেটা যেমন 'কাস্টইজম' (জাতপাত) ; আবার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লোকেদের খেপিয়ে 'কাস্ট'-এর ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করে যারা ব্রাহ্মণদের রোখবার চেষ্টা করেছে, তারাও তো ঠিক বিপরীত অর্থে 'কাস্টইজম'-এর চর্চা করেছে। তাকে কেউ শ্রেণীসংগ্রাম বলে না কি? অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন সংগ্রাম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শ্রেণীচেতনার উদ্ভব হয়, চেতনার সেই স্তরকে উত্তীর্ণ করে যখন যথার্থই শ্রমিকরা বিপ্লবী শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্ব কী — তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তখনই মজুরশ্রেণী থেকে আসা ক্যাডাররা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে নয়, সঠিক শ্রেণীগত চেতনার ভিত্তিতেই অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক শ্রেণীচেতনার ভিত্তিতেই বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্য এবং আমাদের সমাজের জাতপাতের অবমাননার বিরুদ্ধেও সঠিকভাবে লড়তে শিখবে। একমাত্র তখনই তারা নিজেদের মধ্যে যে জাতগত অবমাননাবোধ (caste humiliation) আছে, তার স্বরূপটিও ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার নিজের মধ্যে যে শ্রেণীগত অবমাননাবোধ রয়েছে, তার বিরুদ্ধেও ক্রমাগত লড়াই পরিচালনা করেই কমিউনিস্ট হবার চেষ্টা করবে।

এছাড়া, আজকাল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বের সর্বজনস্বীকৃত একটি কথারও অতি সরলীকৃত ও বিকৃত ব্যবহার চলছে যে, সত্যিকারের প্রোলেটারিয়ান চরিত্র আয়ত্ত করতে হলে জনগণের সঙ্গে এবং প্রেলেটারিয়েটের সঙ্গে মিশতে হবে। একথা ঠিক, এই জনগণের কাছে যাওয়া, প্রোলেটারিয়েটের সঙ্গে মেশা, শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে যাওয়া, তাদের মধ্যে থাকা এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্ব ও পার্টি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা — এগুলো বিপ্লবী হওয়ার একটি অবশ্য শর্ত, এগুলো কর্মীদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আনতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে থাকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবার থেকে আসা ক্যাডাররা শুধুমাত্র এর দ্বারাই সঙ্গে সঙ্গে প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবী চরিত্র আয়ত্ত করে ফেলবে — এটা হচ্ছে অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। এই যদি হত, তাহলে গান্ধীবাদীরা জনগণের মধ্যে কাজ করেছে;যারা মার্কসবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের মধ্যেও বহুলোকই জনগণের মধ্যে পড়ে থেকে কাজ করেছে। একথা বলা চলবে না যে, তারা সবাই ওপর থেকে বসে বসে জনগণকে শুধু বাণী দিয়েছে। আমাদের দেশেই এরকম হাজার একটা মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতার নমুনা আছে, যারা জনসাধারণের মধ্যে পড়ে থেকে কাজ করা এবং সমস্ত রকমের জঙ্গি লড়াই পরিচালনা করা সত্ত্বেও আজ একদম কমিউনিস্ট বিদ্বেষীতে পরিণত হয়েছে। এমনকী আজও চোখের সামনে দেখতে পাবেন, কমিউনিজমের আদর্শ, ঝান্ডা নিয়ে যারা কাজ করছে, দিনরাত মজুরদের মধ্যে পড়ে থাকছে, তাদের মধ্যেও শ্রমিক আন্দোলনে আজ বেশিরভাগই সুবিধাবাদী, তাদের অনেকেই আজ মালিকের দালালে পরিণত হয়েছে। তারা মজুরদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে মজুরদের কমিউনিস্ট করতে পারেনি, তাদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা আনতে পারেনি, বরং বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার পর্যুদস্ত অবস্থায় মজুরদের যে নিম্নগামী সংস্কৃতি, তারা নিজেরাই তার শিকার হয়ে বসেছে।

শ্রমিককেও বুর্জোয়া ভাবধারা থেকে মুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট চেতনার স্তরে উন্নীত হতে হবে

লেনিন বলেছেন, শ্রমিকদের কাছে যাও, তবে তারা যেমন অবস্থায় আছে তেমন হতে নয়, যাবে তাদের কমিউনিস্টের স্তরে উন্নীত করার জন্য — অর্থাৎ শ্রমিকদের মধ্যে যা আছে, তা গ্রহণ করবার জন্য আমরা তাদের কাছে যাই না। আমরা তাদের জীবন থেকে শিখতে যাই — একথার মানে হল, আমরা প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবী রাজনীতি ও সংস্কৃতির যে ভাবনাধারণা জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে আয়ত্ত করেছি, তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সেটাকে উন্নত করে আবার তাদের মধ্যে সেটা দিই। তাদের কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তোলবার জন্য, উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আমরা তাদের মধ্যে যাই। আমরা যারা তাদের কমিউনিস্ট হিসাবে উন্নত করব, সেই আমরা নিজেরাই যদি কমিউনিস্ট সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে না পারি, তাহলে শুধুমাত্র কতগুলো কমিউনিস্ট রাজনৈতিক বুক্‌নি আউড়ে আমরা কি তাদের বিপ্লবী করতে পারি? না, তা কখনই সম্ভব নয়। তাহলে, জনগণের সাথে সংযোগ এবং জনগণের আন্দোলন যারা পরিচালনা করবেন, তাদের এই আন্দোলন পরিচালনা করার সাথে সাথে দেখতে হবে, তাদের তত্ত্বটা ঠিক কিনা, তাদের রাজনীতিটা বিপ্লবী কিনা এবং তাদের নিজেদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কৃতি পাল্টাবার জন্য তাদের মধ্যে একটা জীবন্ত আন্দোলন তাদের প্রতিনিয়ত'গাইড' (চালনা) করছে কিনা। কাজেই কোন সহজ রাস্তায় এর কোন সমাধান নেই। একজন শ্রমিকও এই সমাজে বুর্জোয়া চিন্তাধারায় প্রভাবিত শ্রমিক। তার অবস্থান, তার সংস্কৃতি সমস্তই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত — এই কথাটা সবসময় মনে রাখতে হবে। একথা ঠিক যে, সে শ্রমিক বলে তার পক্ষে বিপ্লবী শ্রেণীচরিত্র অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সোজা, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাকে নিজেকে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব থেকে মুক্ত করে কমিউনিস্ট চেতনার স্তরে উন্নীত হতে হবে, নিজেকে পরিবর্তিত করতে হবে কমিউনিস্ট হিসাবে। যার জন্যই মার্কস বলেছেন, এই সমাজের শ্রমিকরা আগে নিজেদের বিপ্লবী হিসাবে পরিবর্তিত করবে, তবে সে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের একথাও মনে রাখা দরকার যে, 'লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট,' অর্থাৎ, বুর্জোয়া শোষণের যাঁতাকলে এবং তার অপসংস্কৃতির শিকার বনে গিয়ে প্রোলেরিয়েটের যে অংশ ইতিমধ্যেই 'লুম্পেনে' পর্যবসিত হয়েছে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না এই লুম্পেন সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লব সংগঠিত করা দূরের কথা, তাদের দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাই সম্ভব নয়। মার্কস থেকে শুরু করে মাও সে-তুঙ পর্যন্ত সকলেই বলেছেন, এই সমস্ত লুম্পেন প্রোলেটারিয়েটরা অবস্থাবিশেষে একটা সংগঠন গড়ে তুলতে পারে, এমনকী নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ালড়িও করতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা তারা বিপ্লব সংগঠিত করতে পারে না। বরং ইতিহাসে দেখা গেছে, এইসব লুম্পেন প্রোলেটারিয়েটদের সংগঠনগুলো কার্যকরীভাবে চিরকাল বিপ্লবের বিরোধিতাই করে থাকে এবং মেকি বিপ্লবী দলগুলোর দ্বারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মধ্যবিত্তশ্রেণীকে মধ্যবিত্তসুলভ ভাবালুতা, দোদুল্যমানতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতি ও অভ্যাস আচরণ বিসর্জন দিতে হবে

এখন, এই কমিউনিস্ট হবার প্রক্রিয়ায় মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ছাড়তে হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীসুলভ ভাবালুতা, পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা, অভ্যাস, আচরণ ও সর্বোপরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতি। আর, শ্রমিককে ছাড়তে হবে শ্রমিকদের যেগুলো গ্রাম্য অভ্যাস অর্থাৎ পুরনো সামন্তী সমাজের কুসংস্কার এবং নানা ধরনের বুর্জোয়া অপসংস্কৃতি এবং নোংরা ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে তাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে। আমাদের দেশের মত একটি পিছিয়ে পড়া অথচ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার তিন ধরনের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হচ্ছে, ততক্ষণ তিনটে ভাগে তাকে ভাগ করা যায়। শ্রমিকরা যারা চাষী পরিবার থেকে এসেছে এবং চাষী সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ সমাজের, সামন্তী সমাজের সংস্কার, একগুঁয়েমি এবং নানাধরনের গ্রাম্য অভ্যাস। তারা শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ সামন্তী সমাজের সংস্কৃতির তারা শিকার। তার থেকে তাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে। আর একদল শ্রমিক যারা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে অর্থনৈতিক কারণে মজুরে পর্যবসিত হয়ে

শ্রমিকদের মধ্যে এসেছে, তারা শ্রমিকে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও বাবুসমাজের সাথে তাদের সংস্কৃতিগত, অভ্যাসগত, রুচিগত যোগাযোগ আজও চলে না যাবার ফলে তারা মজুরদের মধ্যে নিয়ে আসছে মধ্যবিত্ত বাবুসমাজের ভাবালুতা, পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা এবং ব্যক্তিনেতৃত্বের কোন্দল ও অর্থনীতিবাদ। আর একদল শ্রমিক, তাদের সংখ্যা যদিও কম, তারা এই দুটো ভাবধারা থেকেই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে শ্রেণী অবস্থানের দিক থেকে সর্বহারার সবচাইতে বিপ্লবী অংশে পর্যবসিত হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে তারাই সবচাইতে বেশি বিপ্লবী — এই অর্থে যে, পুরনো সমাজের সাথে তাদের সমস্ত প্রকার সামাজিক সম্পর্কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারাও বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে যেটা সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি, অর্থাৎ নোংরা ব্যক্তিবাদ, বেপরোয়াভাব — যে বেপরোয়াভাব হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন অর্থাৎ অন্ধ প্রকৃতির — তার সম্পূর্ণ শিকার। শিক্ষিত, তথাকথিত জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বুর্জোয়াদের মধ্যে শিক্ষার আবরণের জন্য যেটাকে আমরা অন্যরকমভাবে দেখি, শিক্ষা বাদ দিয়ে ঐ নোংরা ব্যক্তিবাদের প্রভাব এই সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে এই যে খুব অগ্রণী অংশ, যারা শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে বিপ্লবী, তাদেরকেও যদি ঐ বুর্জোয়া নোংরা ব্যক্তিবাদের মানসিকতা থেকে মুক্ত করে তাদের মধ্যে সমষ্টির প্রতি দায়-দায়িত্ব এবং সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারা না যায় এবং তাদেরকেও যদি কমিউনিস্ট চেতনার স্তরে উন্নীত করতে না পারা যায়, তাহলে তারাও কমউিনিস্ট হতে পারে না। সুতরাং, তাদেরকেও কমিউনিস্ট চরিত্র আয়ত্ত করতে হবে।

উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জন করার সংগ্রাম এড়িয়ে গিয়ে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না

তাহলে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন যে, মার্কসবাদী এবং বিপ্লবী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে সঠিক পদ্ধতিতে সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদকে একটি সত্যিকারের জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে যা জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করবে এবং পরিবর্তিত করবে। শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য মার্কসবাদ — এভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করলে বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি সূত্র মুখস্থ করে ফেলতে পারলে, তার দ্বারাই কেবলমাত্র কেউই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে পারে না। পার্টির কোন না কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্যে সক্রিয়ভাবে নিজেকে যুক্ত রেখে ব্যক্তিচিন্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ও স্বার্থের সাথে অর্থাৎ বিপ্লবের স্বার্থের সাথে একাত্ম করে গড়ে তোলার নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জন করার পথেই কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকারী কর্মীতে পরিণত হতে পারে। এই সংগ্রামটিকে এড়িয়ে গিয়ে যে কেউ যত বড় ক্ষমতাবানই হোন না কেন, কারোরই কমিউনিস্ট হবার উপায় নেই। এমনকী, মানবেন্দ্র নাথ রায়-এর মতো যে ক্ষমতাবান 'ইন্‌টেলেকচুয়াল', তিনিও বাস্তবে এই সংগ্রামটি এড়িয়ে গিয়েই শেষপর্যন্ত কমিউনিস্ট হতে পারলেন না। অথচ, মানবেন্দ্র নাথ রায়ের পান্ডিত্য (intellectual ability) এত উঁচুস্তরে ছিল যে, সেই পান্ডিত্যের কাছে সুভাষ বোস, জহরলাল নেহেরু এবং এমনকী তদানীন্তনকালের অনেক সমাজতান্ত্রিক এবং মার্কসবাদী নেতারাই মাথা ঝুঁকিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে এই একজন মাত্র মার্কসবাদী বলে পরিচিত নেতা, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাতেই বিচরণ করেছিলেন। অথচ, এতবড় একটা ক্ষমতা নিয়ে লেনিনের সঙ্গে থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শেষপর্যন্ত ঘোরতর কমিউনিস্ট বিদ্বেষীতে পরিণত হয়েছিলেন। 'ইনটেলেকচুয়াল অ্যাপটিচুড' এত উঁচুস্তরে থাকা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দখল — এসব কোনও কিছুই শেষপর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বগুলোকে আয়ত্ত করার সাথে সাথে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে সেগুলোকে সংযোজিত (co-ordinate) করতে না পারার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি আচরণ, অভ্যাস ও রুচির প্রকাশ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রেখে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে একাত্ম করে নিজেদের গড়ে তোলার সংগ্রামটি তিনি পার্টির অভ্যন্তরে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেননি। ফলে, এতবড় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি শেষপর্যন্ত একজন চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট বিদ্বেষীতে পরিণত হয়েছিলেন।

কমিউনিজমের আদর্শের মর্যাদা রক্ষা ও পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করুন

আমাদের দেশের পূর্বের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত এই পার্টিটির ইতিহাস, এদের নেতা ও কর্মীদের কার্যকলাপ, আচার আচরণ পর্যালোচনা করে দেখা গেল, এরা প্রত্যেকেই পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার এই আসল সংগ্রামটি বাদ দিয়েই দল গঠনের চেষ্টা করেছেন। কর্মীদের সততা, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, লড়াই সবকিছু সত্ত্বেও ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্য পার্টি ও বিপ্লবের সাথে জীবনকে একাত্ম করে গড়ে তোলার সংগ্রামটি পার্টির অভ্যন্তরে সচেতন ও যৌথভাবে পরিচালনা না করতে পারার ফলে এদের কোনটিই একটি সঠিক বিপ্লবী দল হিসাবে কোনদিন গড়ে ওঠেনি। ফলে মার্কসবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও পার্টির অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট চরিত্র গঠন এবং যারা পার্টি গঠন করার জন্য আত্মনিয়োগ করল তাদের মধ্যে (১) জীবনের সকল দিক ও প্রতিটি কার্যক্রমকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা, অর্থাৎ সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা, সম-উদ্দেশ্যমুখীনতা;(২) যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত ধারণা এবং (৩) একদল 'প্রফেশনাল' বিপ্লবী (জাত বিপ্লবী) গড়ে তোলার দীর্ঘ ও জটিল সংগ্রামটি এড়িয়ে যাবার ফলে সি পি আই এবং সি পি আই(এম) উভয় দলই কতগুলো পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সাধারণভাবে গৃহীত শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে একত্রে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে এবং নকশালপন্থীরা পার্টি গঠন করলে সেই পার্টিরও এই একই পরিণতি হবে।

তাহলে নানাদিক থেকে আলোচনা করে দেখা গেল, পূর্বের অবিভক্ত এবং বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কোন অংশের দ্বারাই, আর যে কাজই হোক্ না কেন, শোষিত মানুষের পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের মত একটি জটিল সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। আর তত্ত্বগত ক্ষেত্রে এদের নানা ভুলভ্রান্তির কথা বাদ দিলেও যে জিনিসটা আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনে সবচাইতে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে, যা দেশের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করে চলেছে, তা হচ্ছে, এই পার্টিগুলির নেতা ও কর্মীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সুবিধাবাদ এবং আচার-আচরণ-উক্তিতে এদের যে নিম্ন সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত হচ্ছে, যা আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম, সেইগুলি কমিউনিস্ট আদর্শের মত এতবড় একটা বৈজ্ঞানিক ও মহান আদর্শের মর্যাদা জনসাধারণের চোখে ক্রমেই নামিয়ে দিচ্ছে। ফলে কমিউনিজমের আদর্শ এবং বিপ্লবী সংগ্রামের মহান প্রতীক লাল ঝান্ডার মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য এবং পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই এদেশে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা এবং তাকে শক্তিশালী করা দরকার । আর এইজন্যই দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই একটি সাম্যবাদী দলের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই এদেশে গড়ে উঠেছে।

১ নাম্বুদিরিপাদ বলেছেন — ''The three-fold submission – the individual to the organisation, the minority to the majority and the lower unit to the higher – such is the law of organisation ....'' (New Age, Vol XI, No-5, May 1962).

২ ক্যাপিটো-ফিউডালিস্ট লীডারশিপ— যাদের পুঁজিবাদী প্রবণতা বেশি কিন্তু যারা সামন্তী প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

৩ ফিউডো-ক্যাপিটালিস্ট লীডারশিপ— যাদের মধ্যে সামন্তী প্রভাব প্রবল, কিন্তু এ যুগে পুঁজিবাদকে যারা অস্বীকার করতে পারে না।

১৯৬৯ সালের ২৮ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরে দলের কর্মী, সমর্থক, দরদীদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ। কিছু অতিরিক্ত তথ্য ও সমসাময়িক ঘটনা যুক্ত করে সম্পাদিত ভাষণটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে দলের বাংলা মুখপত্র 'গণদাবী'র নভেম্বর বিপ্লব বিশেষ সংখ্যায়।
পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে।
পরবর্তীকালে বহুবার বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।